অনুভব

নতুন প্রজন্মের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার চারণক্ষেত্র

সংখ্যা—১

একুশে স্মরণে

বাংলা বিভাগ

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

অনুভব

নতুন প্রজন্মের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার চারণক্ষেত্র

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড.আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ

অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ

পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর মহাঃ হবিবুর রহমান

উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ

সম্পাদক

মোঃ রবিউল ইসলাম

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক

পুলক কুমার সরকার

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

বাংলা বিভাগ

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর আল-ফারুক চৌধুরী

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

মোহাঃ ওলিউর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোঃ কামরুজ্জামান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড.মোঃ ইব্রাহীম আলী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড.ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোহাঃ ইকবাল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মঈন উদ্দীন আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আহম্মদ শরীফ

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

শুভেচ্ছা মূল্য

বিশ টাকা

প্রকাশকাল

ফাল্গুন ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

যোগাযোগ

০১৭১৬২৮৫৭৬৩, ০৭২১৭৭২৬২৩

bangladepartment1959@gmail.com

সম্পাদকীয়

আমাদের ভাষা আন্দোলনের ছয় দশক অতিক্রম করে সাত দশকের দ্বারপ্রান্তে। নতুন দশকের নতুন চেতনায় আমরা বরণ করতে চলেছি মহান এই দিনটিকে। বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের সোপান অমর একুশ বাংলার ইতিহাসে অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল, ভাস্বর। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক মুক্তির সূতিকাগার '৫২-এর একুশ। দিবসটি মহান শহীদ দিবসরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে। ভাষা আন্দোলনে বাঙালির প্রাণশক্তির বীজমন্ত্র রোপণ করেছিলেন যেসব বাঙালি সেইসব বীর বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি জাতি বহন করে চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তাই আমাদের নিকট তাঁরা আজ চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়। তাঁদের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও অনিঃশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাংলার ইতিহাস যুগে যুগে বহুবার বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। পাকিস্তানি শাসনকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। '৫২-এর ভাষা আন্দোলেনে যার সূচনা, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে তার সমাপ্তি। একুশ আমাদের চেতনার, আত্মোপলব্ধির, আত্মবিশ্লেষণের; জাতীয় জাগরণের মাইলফলক। এ দিন থেকেই শুরু হয় পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াই। এ লড়াই আমাদের অস্তিত্বের লড়াই, জয়ের লড়াই। এই আন্দোলনের মাধ্যমে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ছাত্রসমাজসহ সমস্ত দেশবাসী এই আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিল নিজেদের অস্তিত্ব ও জীবন সংগ্রাম হিসেবে। তাই এই দিনটির আবেদন বিশাল ও ব্যাপক। ভাষা আন্দোলনের শোক বর্তমানে শক্তিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ এবং তাদের মূলমন্ত্র একুশ–আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশের এই চেতনা সঞ্চারিত হোক, সঞ্জীবিত করুক সবাইকে, সমস্ত জাতিকে।

আজ আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, রাষ্ট্রভাষা। বিশ্বায়নের এই আকাশ-সংস্কৃতির যুগে ভাষার ওপর চলছে গভীর ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক আগ্রাসন। অপসংস্কৃতির এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করবার প্রত্যয়ে ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের 'বাঙলা সাহিত্যিকী'র পাশাপাশি সৃজনশীল নতুন প্রকাশনা 'অনুভব'। আমাদের বিশ্বাস সৃজনশীল লেখক-পাঠকদের নিকট তা হয়ে উঠবে অনাবিল সাহিত্য চর্চার স্বাধীন চারণক্ষেত্র।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ : ৫-২৫

মহাঃ হবিবুর রহমান–একুশের অনুভব

ড.ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী–বাংলা ভাষা এবং 'অমর একুশ'

মোঃ ইকবাল হোসেন–একুশের ভাবনা

মোঃ তানভিরুল হক–বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রমিত বাংলা

মোঃ আব্দুস সামাদ–রাজশাহী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের তাৎপর্য ও পটভূমি

মোঃ মামুন আলী–মাতৃভাষার সংগ্রাম ও অর্জন

কামরুল ইসলাম সাঈদ–একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য

আব্দুন নূর আল হাসান–তুমি পারবেই

মোঃ বখতিয়ার হোসেন–একুশের চাওয়া

কবিতা : ২৭-৫৬

আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ–একুশের গান, ক্যাম্পে

কামরুজ্জামান গোপন–অনিরুদ্ধ একুশ

জলিল আহমেদ–শাহবাগ আমাকে বাধ্য করেছে

মোঃ রবিউল ইসলাম–একুশের প্রাণ

মোস্তফা আহাদ তালুকদার–বেপার

গোবিন্দ কুমার সাহা–জীবন নদীর বাঁকে/ সুমন সৌপর্ণ্য–ভিনগ্রহী

তৌহিদ ইমাম–স্বপ্ন যখন আততায়ী

খালেদ মাহমুদ আকাশ–দ্বিধা/ নাফিস-ই-আনোয়ার–জলছবির খাতা

সোহেলী শবনব চৈতী–প্রেমিকার প্রেমের ফাঁদে মাতৃভাষা

মোসাঃ জান্নাত–ভাষার জন্য আত্মত্যাগ/ মোসাঃ মাহবুবা আলম মোস্তারী–পাখিগুলো

মোসাঃ হাফিজা খাতুন হ্যাপি–একাকী বিকেল

আশরাফুল ইসলাম অনু–বাংলা আমার মা/ খন্দকার খাদিজা ইয়াসমিন–কল্পনার দেশ

রাশেদুল হক নিপু–স্মৃতির দোলা/ মনিকা পাল–বীর শহীদ যোদ্ধা

অপেক্ষা সাহা–কেন এত ব্যবধান/ নীলিমা হাসনাত–স্বপ্ন

মাহমুদা খাতুন মিলি–একুশের আগমনী বার্তা/ প্রীতম কুমার পাল–অদেখা চিরচেনা '৫২

ইসরাত জাহান–আমাদের একুশ/ মোস্তাকুর রহমান–একুশের গল্প

নাফিস নুসরাত এষা–বীর বাঙালি/ তাসনুভা তাবাসসুম–একুশ

এস.এম. সাহেদ আহমেদ–স্বাধীনতা/ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান–মহান একুশ

মুনমুন কেয়া শীলা–প্রতীক্ষায় জেগে থাকা রাত্রি

মোঃ মহিদুর রহমান–আমার একুশে ফেব্রুয়ারি

মোঃ মাহমুদুল হাসান সাব্বির–একুশ/ রুম্মান আরা হোসেন দৃষ্টি–আমার রাঙা বাংলাদেশ

বৈশাখী সরকার–একুশের চেতনা/ মৌসুমী আক্তার–একুশ মানে

গল্প : ৫৭-৭৯

চন্দন আনোয়ার–কাফনচোর

সোলায়মান সুমন–টাঙাওয়ালা

মাহী ফ্লোরা–ফুল (চকমকি মেঘের আরেক নাম)

ইসমাঈল হোসেন সোহাগ–অমানুষ

অর্পিতা সরকার–বলিরেখার দিনগুলোয় প্রেম

মহাঃ হবিবুর রহমান

একুশের অনুভব

`Khawaja Nazimuddin speaking in his double capacity as prime minister and president of Pakistan Muslim League, unequivocally declared yesterday that Urdu alone, shall be the State Language of Pakistan.'

এই একটি খবর ভাষা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গকে দাউ-দাউ করে জ্বালিয়ে দিল। একমাত্র সেই সময়ের দৈনিক 'অবজার্ভার' এই আন্দোলনের খবর ছড়াল সারাদেশে। এই আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রক্তের লাল রঙে রাঙিয়ে তোলে, সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাসের। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলনের, এই রক্তের ফসল। তাই একুশ একটি চেতনা, একুশ প্রেরণা।

ছেলেরা যখন পড়ে, তিন সাতে একুশ। তখন মনে হয় এত পরিচিত অংক সম্ভবত: আর নেই। তাই শব্দটা বা অংকটা শোনার সাথে সাথে মনে-প্রাণে কেমন যেন একটা সাড়া জাগে; একটা অজানা শিহরণ শিরা-উপশিরায় অনুভূত হয়। এ অনুভূতি সবার। বাঙালি মাত্রেই একুশের নাম শুনলে একটা বিশেষ দিনকে স্মরণ করবে। এ দিনটি একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি এখন তিনভাবে দেখি। প্রথমত: একুশ একটি আন্দোলনের, একটি সংগ্রামের ও অধিকার আদায়ের প্রতীক। কারণ এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের মত এক বিরাট আন্দোলন ও সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। দ্বিতীয়ত: একুশ বাঙালি জাতির একটি দীর্ঘ ও বহু প্রতীক্ষিত ফসল। কারণ '৪৮ সালে শুরু হওয়া আন্দোলন এনে দিল স্বাধীনতার স্বর্ণ সোপান। আর তৃতীয়ত: একুশ একটি চেতনা ও যন্ত্রণা। কারণ এই চেতনাই আমাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর যন্ত্রণার কারণ একুশ ক্রমশ: আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হচ্ছে।

একুশের চেতনা আমাদের এত গভীরে যে অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি, কী করে এমনটি হলো? বাংলাদেশে শহীদের অভাব নেই, শহীদ দিবসেরও কমতি নেই। কোন্ বৈশিষ্ট্যগুণে ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস ছাড়িয়ে গেল অন্য সমস্ত শহীদ দিবসকে? কী করে বরকত-সালামের ছেঁড়া শার্ট রূপান্তরিত হলো জাতীয় মুক্তির পতাকায়। যে নিরক্ষর কৃষক মাঠে হাল চালায়, যে মজুরের বর্ণমালার সাথে পরিচয় ঘটেনি কোনদিন, তার কাছে ভাষা আন্দোলনের মূল্য কী, আবেদন কতখানি? বিষয়টা হঠাৎ একদিন পরিষ্কার হয়ে গেল একটি বিদেশি চলচ্চিত্রের কাহিনি পড়ে। ছবিতে দেখানো হয়েছে জার্মান ফ্যাসিস্টরা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখার নামে ফরাসি চিত্রকলার কিছু অমূল্য নিদর্শন অপহরণের চক্রান্ত করলে ফরাসি দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ কর্মীরা সুকৌশলে তা ব্যর্থ করে দেন। এই ঘটনায় আত্মদান করেন একজন সামান্য রেলকর্মী, যাঁর চৌদ্দপুরুষের হয়তো সুযোগ হয়নি চিত্রকলা দেখার বা উপভোগের। ভেবেছিলাম, ওই রেলকর্মী পেইন্টগুলো রক্ষার জন্য জীবন দিতে গেল কেন? সে তো মনে করতে পারত চিত্রগুলো ফ্রান্সে থাকলেই কী আর জার্মানরা নিয়ে গেলেই বা কী? কোনদিন সে এগুলো উপভোগেরই সুযোগ পাবে না। তার কাছে দুই-ই সমান। কিন্তু রেলকর্মীটি বলা যেতে পারে আমার চোখ খুলে দিল। বন্ধুরা যখন তাকে বোঝাল ওগুলো ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ, তার ঐতিহ্যের অঙ্গ, ওগুলো নিয়ে যাওয়ার অর্থ ফরাসি জাতির দরিদ্র হয়ে যাওয়া, তখন তার মধ্যে সাড়া জাগতে বিলম্ব হয় নি। যা কোনদিন তার ভোগে আসবে না, জাতির গর্বের ধন সেই মূল্যবান, প্রায় অপার্থিব চিত্রগুলো রক্ষার জন্য সে অকাতরে প্রাণ দিল, জাতীয়তাবোধ এমনি প্রচণ্ড শক্তিধর।

ভাষা আন্দোলনের পেছনেও রয়েছে ওই একই জাতীয় চেতনা। তাই ভাষা আন্দোলন এত দুর্বার, তার আবেদন এমন সর্বত্রগামী। ভাষা আন্দোলনে যারাই অংশগ্রহণ করে থাকুক না কেন, এ লড়াই ছিল বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের লড়াই। গোটা জাতির স্বার্থ এর সাথে জড়িত। তাই এর আবেদন ছড়িয়ে গেল শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডি। ছাত্রদের লড়াইকে দেশবাসী গ্রহণ করলো তাদের সকলের লড়াই বলে।

একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠি। চারপাশের জগতকে আগের মতই দেখে ভাবি, যা করার ছিল তা করা হয় নি, যা বদলানোর ছিল তা বদলানো হয়নি, সব কিছুই যেন অসমাপ্ত রয়ে গেছে। একেবারেই যে কিছু হয় না তা নয়, শহীদ মিনার যেরকম মাজা-ঘষা চলে, আমরাও কিছুটা সেরকম প্রসাধন সেরে নিই। এর মধ্যে যেটুকু প্রাণস্পন্দন চোখে পড়ে, তা হল একুশ উপলক্ষে বইপত্র কেনার একটা মৌসুম পড়ে যায়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বই কেনা, বিভিন্ন সেমিনারে শ্রোতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভীড় চোখে পড়বার মত। ভাষার জন্য ছাত্ররা প্রাণ দিয়েছে। আর একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতির চিত্তে জাগরুক রাখার জন্য প্রথম তরুণরা বিশেষভাবে ছাত্ররা এগিয়ে আসে সংকলন প্রকাশের জন্য। আমাদের সাহিত্যের বেগবান ধারাটা একুশের কাছে অনেকটা ঋণী। প্রতিবছর এ মাসটি আমাদের জীবনে আত্মোপলব্ধির সুযোগ এনে দেয়। আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষুদ্র অংশে কিছুটা উত্তাপ এনে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর রাজশাহী কলেজে আড়ম্বরের সাথে পালিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি।

উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

বাংলা ভাষা এবং 'অমর একুশ'

বাঙালি রক্তসাংকর্যে গড়ে ওঠা এক ব্যতিক্রমী জাতিসত্তা। বাংলা ভাষাও অনুরূপ বহু ভাষিক মিশ্রণে এক স্বতন্ত্র ভাষা। বাঙালির চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যও একেবারে ভিন্ন। এ সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্ববহ। তিনি বলেছেন: "শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য...আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য...।...যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বার বার বাঁচাইয়াছে।" বাঙালির দুর্ভাগ্য বরাবর কোনো না কোনো 'বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি' দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগে উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্যবাদীর রোষানলে পড়েছে বাংলা ভাষা। তাদের নিকট বাংলা কেবলই 'ভাষা', এ ভাষায় পুরাণাদি রচনা করলে 'রৌরব' নামক নরকে পতিত হতে হবে। উন্নাসিক মুসলমানরাও 'বাংলা ভাষা'য় কাব্য রচনায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন– হিন্দুয়ানী লেখা তারে না পারি লিখিতে (হাজী মুহম্মদ), 'আরবী আঙ্গুলে যদি বাঙ্গালা লিখন/বুঝি শুনি কার্য কৈল্লে পাপ বহুতর/সত্তর নবীর বধ তাহার উপর (নামাজ মাহাত্ম্য–মুহম্মদ জান)। কারো কাছে এ ভাষা 'প্রাকৃত ভাষা'; কারো মতে 'লোকভাষা'; কেউ বলেছেন 'দেশী ভাষা' । এভাবে বাংলা ভাষা নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে 'বাংলা ভাষা'র মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। এর জন্য বাঙালিকে ত্যাগের ইতিহাস গড়তে হয়েছে, যা আজ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অনুসরণীয়।

বাংলা ভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ শুধু নয়, বাংলা ভাষাবিদ্বেষীদের মধ্যযুগেরই একজন মুসলিম কবি তীব্র বিদ্রুপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। যারা বঙ্গে জন্মগ্রহণ করে বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করে কবি তাদের জন্ম সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদী কিম্বা গোঁড়া মুসলিম নয়, বৃটিশ আমলেও ইংরেজদের নিকট বাংলা ছিল উপেক্ষিত ভাষা। দু'একজন ছাড়া। তাই ঈশ্বরগুপ্তের ক্ষুব্ধ উচ্চারণ: 'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ/ দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ। অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে/কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে।' অবশ্য বাঙালির এ ভ্রম কাটতে বেশিদিন লাগে নি। ক্রমেই মাতৃভাষার তীব্র আকর্ষণ বাঙালিকে করেছে সংহত, সমুন্নত, একতাবদ্ধ। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ বাঙালিকে বোধোদীপ্ত করেছে। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের শক্তির চেয়ে মাতা-মাতৃভাষা-মাতৃভূমির শক্তি যে প্রবল, তা দেখেছে বিশ্ব। আর ভাষা আন্দোলনের এমন বিরল ইতিহাস রচনার মহিমান্বিত গৌরবটুকু শুধুই বাঙালির।

আমি নতুন করে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বলতে চাচ্ছি না। পাকিস্তানের গণপরিষদে প্রথম ভাষার প্রসঙ্গ টানা হলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দৃঢ়তার সাথে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বাংলা ভাষার কথা। তৎকালীন পাক-শাসক সে বিষয় তাচ্ছিল্যের সাথে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সময় থেকেই বিষয়টির বাস্তবতা নিয়ে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, যদিও বাইরে তা প্রকাশ করতে নারাজ। দম্ভ, দণ্ড আর ত্রাসের শাসন কায়েম করে বাঙালির সামগ্রিক শক্তির উৎসে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছ শাসকবর্গ। 'কাকোদর সদা নম্রশিরঃ; কিন্তু তার প্রহারয়ে যদি কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।' (মেঘনাদবধ কাব্য) । কবির এ উক্তির যাথার্থ্য 'বায়ান্ন'র একুশ। মাতৃভাষার মধ্যে রয়েছে অমিয়ধারা, যা মানুষকে জন্মলগ্ন থেকে মাতৃদুগ্ধের মত পুষ্ট করে। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!/তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!/...গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।' (অতুলপ্রসাদ সেন) কিম্বা 'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশীয় ভাষা/পুরে কি আশা? (রামনিধি গুপ্ত) এসব গান ও কবিতা বাংলার মানুষের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি সুগভীর মমত্ববোধের প্রকাশ। বিশ্বকবির 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'–সমগ্র বাঙালির আন্তরিক উচ্চারণের বাণীবিন্যাস।

আমাদের ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করেছে এমনি অনেক কবিতা ও গান। 'মাতৃভাষা বাংলা চাই' বলে যে মিছিল পাকশাসকের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল, তার পেছনে ছিল হাজারো প্রেরণা। বাঙালি জাতির গৌরবমণ্ডিত পরিচয় 'একুশেই' নিহিত। প্রবলের পীড়ণেও শক্তি হারায় নি বাঙালি, কোনো রক্তচক্ষু কিংবা নৃশংসতা বাঙালিকে বিচলিত করতে পারে নি। এর মূলে প্রোথিত আছে–বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমিত প্রাণশক্তি। 'অমর একুশ' বাঙালি জাতিসত্তাকে করেছে জাগ্রত, বাংলা সাহিত্যকে করেছে ঋদ্ধ। একুশের উপর লেখা প্রথম কবিতা মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী'র 'আমি এখানে কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' তে কবি বলেছেন:

আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল
...যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে
চেয়েছে তাদের জন্য
আমি ফাঁসির দাবী করছি।

এ কবিতার গভীর আবেগ সমস্ত বাঙালির। একুশের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন কবি তাঁর কবিতায় এভাবে–

কালো পতাকায়
প্রাচীর-পত্রে
অশ্রু-তরল রক্তরঙের লিপি
ক্রোধের-ঘৃণার
ভয়াল বিস্ফোরণ
একুশে ফেব্রুয়ারী। (সিকান্দার আবু জাফর)
'সোচ্চার মুখের ভাষা অত্যাশ্চর্য
যেন শেষ মাঘে বৃষ্টির কল্যাণ
...মধুভাণ্ড, গুচ্ছ গুচ্ছ শব্দের স্তবক
আ-মরি বাংলাভাষা। (সানাউল হক)

'ওরা আমার মুখের কথা কাইরা নিতে চায়' গানটিতে আবদুল লতিফ-এর আবেগের সাথে সাথে অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে। আজো একুশের প্রভাতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে যে সঙ্গীতধ্বনিতে, সেই বিশেষ গানটির রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী। গানের কথা হয়ে যায় প্রাণের কথা–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী/আমি কি ভুলিতে পারি।' সে সময়ের সকলেই একুশের চেতনা এবং অঙ্গীকার, সেইসাথে ক্ষোভ, ঘৃণাসহ নানান অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তাঁদের সৃষ্টিতে। হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখের কবিতায় ভাষা পেয়েছে সমগ্র বাঙালির উচ্চারণ।

বায়ান্ন-তে যে সংশয় কবিচিত্তকে আহত করেছে, বর্তমানে বসে একই রকম ভাবনা আবার আমাদের বিচলিত করছে। কবি ওমর আলী তাঁর কবিতায় বলেছেন: অ থেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ফেলে দিয়ে শিখি অন্য ভাষা/বাঙালীর গর্ব, বাঙালীর আশা কি করে বাঁচাই? কবি শামসুর রাহমান বলেছেন: 'এখন তোমাকে ঘিরে ইতর বেলেল্লাপনা চলছে বেদম/এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি/এখন

তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষমাস/তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো/ বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।' শামসুর রাহমানের এই কয়েকটি চরণের সত্যতা নিরূপণের জন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই, কেবল চারিদিকে একবার সচেতন দৃষ্টিপাতেই সম্ভব। তবে এও সত্য সচেতনের সংখ্যা স্বল্প হলেও তা দুর্জয় হতে পারে। আশার কথা বাঙালির মধ্যে মন্থর গতিতে হলেও সচেতনতা তৈরি হচ্ছে।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

মোঃ ইকবাল হোসেন

একুশের ভাবনা

আমাদের মাতৃভাষার জন্য রাজপথে আন্দোলন চলেছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সাত বছর ধরে। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠায় যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, বরকতসহ নাম না জানা অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে সে দাবি অর্জিত হয়েছিল। এরপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দূর সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলেও শর্ত ছিল কুড়ি বছর পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একটি কমিশন গঠন করবেন এবং কমিশন বিচার করে দেখবে বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উপযুক্ত হয়েছে কি না। এ সময় ইংরেজি থাকবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পরবর্তীতে জেনারেল আইউব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান স্থগিত করেন। ফলে বাংলা ভাষার স্বীকৃতিও স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৬৩ সালে আইউব খান সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে যে সংবিধান চালু করেন তাতে উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে পূর্বের মতই কুড়ি বছর পর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একটি কমিশন গঠন ও কমিশন কর্তৃক উভয় ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উপযুক্ত হয়েছে কি না তা বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়। ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন অত্যন্ত দ্রুত ঘটতে থাকে। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুততার সাথে বাড়তে থাকে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে রাস্তা-ঘাটের বিভিন্ন সাইনবোর্ড ও গাড়ির নম্বরপ্লেটগুলো রাতারাতি বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্রের তৎকালীন কর্মকর্তা জামিল চৌধুরী শিল্পীদের সম্মানী 'বাংলা চেক' এর মাধ্যমে দেয়া শুরু করেন। মোট কথা ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় প্রায় সবক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে যায়। স্বীনতার পর ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষা বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষিত হয়।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের সূর্য সন্তানদের আত্মদানকে এতদিন শুধু আমরাই জাতীয় পর্যায়ে স্মরণ করেছি। কিন্তু একুশের চেতনা ও আত্মত্যাগ এখন শুধু বাঙালি আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি এখন সারা বিশ্বে পালিত ও স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রধান তাৎপর্য হল পৃথিবীর সমস্ত মাতৃভাষাকে সম্মান দেখানো। শুধু সম্মান দেখানো নয়, ছোট বড় সব জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকার যাতে রক্ষিত হয়, এই দিবস পালনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়া হয়। দিবসটি পালনের অন্য উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন বড় ভাষার চাপে ছোট ভাষাগুলো যেন হারিয়ে না যায়, সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া। যেমন ১৮৬১ সালের ১ মে শিকাগোর শ্রমিক হত্যা দিবসটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের সকল নিপীড়িত শ্রমিকের অভ্যুত্থানের প্রতীক দিবস হিসেবে। এ দিবসটি পালন করার অর্থ শুধু শিকাগোর শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ করা নয়, সারা বিশ্বে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে নির্বাচন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে একধরণের স্বীকৃতি জানাল।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে আগামী একশ বছরের মধ্যে তিন হাজারের মত ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 'দি ল্যাংগুয়েজেস অব দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে পৃথিবীর ভাষা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনার ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেখা যায়, বর্তমানে পৃথিবীতে ছয় হাজারের উপরে ভাষা

আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ অর্থাৎ মাত্র তিন শত ভাষা দিয়েই পৃথিবীর ৯৬ শতাংশ মানুষ কথা বলে। অবশিষ্ট ভাষাগুলোর মধ্যে বিশেষ করে যে সব ভাষায় কথা বলার লোক এক লাখের মত, সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু এখন অবলুপ্তির মুখে। এ হিসেবে পৃথিবীতে প্রতি দু'সপ্তাহে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে একটি করে ভাষা। আমাদের অবহেলা, অবজ্ঞা আর আগ্রাসনের ফলে প্রকৃতি ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে বিরল প্রজাতির মাছ, পাখি, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ। কিন্তু ভাষা দরিদ্র হচ্ছে তার চেয়ে অন্ততপক্ষে চারগুণ দ্রুত। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ভাষা ছিল 'ল্যাটিন'; কিন্তু এ ভাষায় এখন আর কেউ লেখেও না কথাও বলে না। ভারতীয় উপমহাদেশের এমন একটি ভাষা 'সংস্কৃত', ধর্মীয় কাজের বাইরে এর ব্যবহার নেই। মধ্যযুগে ব্রিটেনের একটি ভাষা ছিল 'কুর্নিশ', ১৯৭৭ সালে একজন মহিলার মৃত্যুর পর ঐ ভাষাটিও লুপ্ত হয়ে যায়। এখন পৃথিবীতে যে ছয় হাজারের উপর ভাষা টিকে আছে তার মধ্যে এমন অনেক ভাষা আছে যাতে কথা বলে ১০ জনেরও কম। এর মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই ২৮ টি এধরণের ভাষা আছে। এছাড়া একশ জন কথা বলে এ রকম ভাষা আছে পাঁচশটি। এক হাজার পাঁচশটি টি ভাষা আছে যার প্রতিটিতে কথা বলে একহাজার জনেরও কম লোক। বর্তমান বিশ্বের লোকসংখ্যা ৬০০ কোটি হলেও এর ৪৭০ কোটিরও বেশি লোকের মাতৃভাষা মাত্র বাইশটি। এসব ভাষাভাষীর সংখ্যা বর্তমানে সর্বনিম্ন পাঁচ কোটি এবং সর্বোচ্চ একশ পঁচিশ কোটি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাষা হারায় কেন? এর সোজা উত্তর কোন ভাষায় যদি কথা বলার লোক না থাকে তাহলে সে ভাষা হারিয়ে যায়। সম্ভবত প্রধান যে কারণে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা হারিয়েছি তা হল ঔপনিবেশিক আগ্রাসন। এই আগ্রাসনের ফলে মানুষ নিজেদের ভাষা হারিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও নিজেদের ভাষাকে উদ্ধার করা আর সম্ভব হয় নি।

সম্প্রতি অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ফলেও অনেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের দানব অনেক ছোট-বড় ভাষা গিলে ফেলেছে। এখন আমরা সবাই অর্থনৈতিকভাবে একধরণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছি। বড় ভাষা না শিখলে সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন। সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এখন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, নিজের ভাষা শেখার বদলে ইংরেজি বা ফরাসির মত প্রধান ভাষাকে নিজেদের একমাত্র ভাষা হিসেবে গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

মাতৃভাষার সাথে জাতির নিজস্ব পরিচয় জড়িত। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিদেশি তথা ইংরেজির ব্যাপক প্রভাব। ষাটের দশকে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার যে ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল বর্তমানে তা অনেকটা ম্রিয়মান। সাইনবোর্ডগুলো লেখা হচ্ছে ইংরেজিতে এবং বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল আবার ইংরেজিতে প্রদান করা শুরু হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত ইংরেজি বাধ্যতামূলক। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র থেকে শুরু করে সনদপত্র পর্যন্ত দেয়া হয় ইংরেজিতে। সর্বক্ষেত্রে ইংরেজির প্রভাব ব্যাপক হলেও বাংলা ভাষা টিকে থাকবে তার ঐতিহ্য ও সৃষ্টি প্রাচুর্যের জন্য। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি লিখে নোবেল পেয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ এ ভাষারই কবি, পথের পাঁচালী এ ভাষাতেই রচিত। বাংলা আজ শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের বসতি স্থাপন বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক রূপ প্রদানের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করছে। নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিসসহ বিশ্বের অনেক বড় বড় শহরে শোভা পাচ্ছে বাংলা সাইনবোর্ড, প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা পত্র-পত্রিকা, চলছে বাংলা রেডিও-টিভি। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় লন্ডনের স্কুলগুলোতে ইংরেজিভাষীদের পরেই বাংলা ভাষীদের স্থান। সিটি অব লন্ডন, টাওয়ার হ্যামলেটের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশের উপরে বাংলায় কথা বলে। কাজেই আজকে যারা ইংরেজি না জানার জন্য মনে করছেন পিছিয়ে পড়েছেন, একদিন হয়ত দেখা যাবে বাংলা জানার জন্যই তারা এগিয়ে যাচ্ছেন।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

মোঃ তানভিরুল হক

বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রমিত বাংলা বানান

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি একটি মুক্তিযুদ্ধের ফসল। একটি লোকায়িত জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। সুখে-দুঃখে এক হয়ে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র গঠনে তাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। আর সেই অনুপ্রেরণার সূত্র ধরেই আসে একাত্তর। মুক্তিযুদ্ধের সেই হিরন্ময় সময়ে বাংলার দুঃখী মানুষের দুঃখ ভাগ করে নেবার এক অতুলনীয় সুযোগ মেলে। সেই সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেই তারা অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ জীবন বাজি রেখে যে রাষ্ট্রের পত্তন করেছে তার মূলে ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির চেতনা। সেই চেতনার মূলে ছিল বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান তাদের এই চেতনার আদল বেশ খানিকটাই তুলে ধরতে পেরেছিল।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, যে কোনো ভাষায় বানানের স্থিরতা নির্ভর করে ধর্মগ্রন্থ এবং সংবিধানের ওপর। বাংলা ভাষায় কোনো ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় নি। তবে বাংলা ভাষায় রচিত একটি লিখিত সংবিধান রয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধান এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় একমাত্র সংবিধান। অদ্যাবধি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পনের বার সংশোধিত হয়েছে।

সংবিধান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভাষা-পরিকল্পনায় পরিবর্তনের যে সুযোগ থাকে সংবিধান রচিত হওয়ার পর তা আর থাকে না। কারণ সংবিধানের মত পবিত্র দলিলের বানান, শৈলী, বাক্য, শব্দ ও অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। জনপ্রতিনিধিগণই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন আনতে পারেন। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, সংবিধানের দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন কিংবা বানান বা শব্দের সামান্য হেরফের সংবিধানকে বিতর্কিত করে তুলতে পারে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে ভাষার রূপ বা অর্থের পরিবর্তন মানুষ করতে পারে। যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিক-ভাষাবিজ্ঞানিগণ তা করেছেনও। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলার বাক্যবিন্যাসে, বাক্যসৃজনে, শব্দগঠনে, বানানরীতিতে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেছেন। তবে এই পরিবর্তনের সময় বাংলা ভাষায় কোনো সংবিধান ছিল না। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যম হওয়ায় এর স্থিরতার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বাক্যবিন্যাসের সঙ্গে অর্থের, শব্দের সঙ্গে তার তাৎপর্যের, বানানের সঙ্গে তার প্রতীকের সম্পর্ক নিবিষ্টতর হয়ে উঠে।

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে বাংলা বানানের বিভ্রান্তি কাটে নি। *বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের* উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত *সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কর্মশিবিরে*, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের একটি পূর্ণাঙ্গ সুপারিশমালা গৃহীত হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও অন্যান্যদের সম্পাদনায় একটি নির্দেশিকা প্রণীত হয় ১৯৯২ সালে। এরপর ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* (১৯৯৮-এ পরিমার্জিত এবং ২০০০-এ পুনরায় সংশোধিত) প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ করে বাংলা একাডেমী বানান অভিধান প্রণীত হয় ১৯৯৪ সালে।

কিন্তু বাংলা একাডেমীর *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ব্যাপকভাবে গৃহীত হলেও সংবিধানের বানানের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় নি অথবা সংবিধানের বানানে প্রমিত বানানরীতি মানা হয় নি। বর্তমান সংবিধানে অনেক শব্দের বানানের সাথে প্রমিত বানানরীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটি তালিকা দেয়া হলো–

বর্তমান সংবিধানের বানান	**প্রমিত বাংলা বানান**		**বর্তমান সংবিধানের বানান**	**প্রমিত বাংলা বানান**
অধিসঙ্ঘ	অধিসংঘ		বেআইনী	বেআইনি
আপীল	আপিল		বীমা	বিমা
ইংরাজী	ইংরেজি		মজুরী	মজুরি
কার্যপ্রণালী	কার্যপ্রণালি		মেহনতী	মেহনতি
কার্যসূচী	কার্যসূচি		মঞ্জুরী	মঞ্জুরি
কোম্পানী	কোম্পানি		মুলতবি	মুলতুবি
চাকুরী	চাকুরি		যুদ্ধবন্দী	যুদ্ধবন্দি
জনশৃংখলা	জনশৃঙ্খলা		রপ্তানী	রপ্তানি
জমিদারী	জমিদারি		রীট	রিট
জারী	জারি		শিরনাম	শিরোনাম
ট্রাইব্যুনাল	ট্রাইবুনাল		শর্তাবলী	শর্তাবলি
তল্লাশী	তল্লাশি		শুনানী	শুনানি
ডিক্রী	ডিক্রি		সঙ্গীত	সংগীত
দেওয়ানী	দেওয়ানি		সরকারী	সরকারি
দন্ডিত	দণ্ডিত		সূচীপত্র	সূচিপত্র
ফৌজদারী	ফৌজদারি		সুপ্রীম কোর্ট	সুপ্রিম কোর্ট
বাঙালী	বাঙালি		স্পীকার	স্পিকার
বাংলাদেশী	বাংলাদেশি			

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধান পনেরবার সংশোধিত হলেও তাতে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান গ্রহণ করা হয় নি। এখন প্রশ্ন হল বাংলাদেশের সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমিত রীতি কতটা গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদটি প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে–

> জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় সৃষ্ট, প্রবর্তিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো নিয়ম বা আইন বা তার অংশবিশেষ যদি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ততটুকু বাতিল হবার কথা। তাই বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান নিয়মের আওতায় সংবিধানে প্রদত্ত শব্দগুলোর সাথে যেগুলোর পার্থক্য রয়েছে সেগুলো বাতিল হওয়া উচিত নয় কি?

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী

মোঃ আব্দুস সামাদ

রাজশাহী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের তাৎপর্য ও পটভূমি

রাজশাহীতে কোনো শহীদ মিনার ছিল না। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানানো ও তাদের স্মৃতিচারণের সুযোগ রাজশাহীবাসির ছিল না। রাজশাহী কলেজের ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংসদ বাংলা ভাষা প্রেমিক ও মহান শহীদ দিবসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজশাহীবাসির প্রাণের ক্ষুধা নিবারণের জন্য রাজশাহী কলেজ টেনিস গ্রাউন্ডে গড়ে তোলেন শহীদ মিনার যা আজ পরিণত হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে।

পাকিস্তান সরকার বাংলাভাষা ও ভাষা শহীদদের প্রতি শুধু বৈরী ছিল না বরং তা নস্যাৎ করার জন্যে ছিল অতিরিক্ত সচেষ্ট। রাজশাহী কলেজে শহীদ মিনার নির্মাণে জেলা প্রশাসন ও কলেজ প্রশাসন থেকে অনেক বাধা বিপত্তি ও হুমকি ধামকি দেওয়া হয়। এই নিবন্ধের লেখক সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি কলেজ টেনিস গ্রাউন্ডে বর্তমান শহীদ মিনার স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

রাজশাহীতে আর কোনো শহীদ মিনার না থাকায় রাজশাহীর সকল স্তরের জনসাধারণ এবং সকল রাজনৈতিক মহল, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন এক কথায় সকল পেশাজীবী সংগঠন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের অসাধ্য সাধনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও মহান আল্লাহ তালার প্রতি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। রাজশাহী শহরের প্রথম শহীদ মিনার এবং শহরের প্রতিটি এলাকা হতে সকল স্তরের পেশাজীবী, শ্রমজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনারে সমবেত হওয়ায় এটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পরিণত হয়। অভিনব নির্মাণকৌশল ও তাৎপর্যপূর্ণ আকৃতিতে গড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে সুন্দর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এই শহীদ মিনারটি যথার্থভাবেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পরিণত হয়েছে। শহীদ মিনার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় তৎকালীন পাকিস্তানের দোসর আলবদর রাজাকার মৌলবাদীদের। সে কারণে মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে তারা শহীদ মিনারকে অপবিত্র করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। এই শহীদ মিনারের চারদিকে চারটি প্রাচীর আছে যা শহীদ বরকত, রফিক, জব্বার ও সালামের স্মৃতি সংরক্ষণ করে। মধ্যস্থলে ১১ (এগার) কোণা বিশিষ্ট স্তম্ভ আছে যা ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের ১১ দফা দাবির স্মৃতি সংরক্ষণ করে। এই স্তম্ভের গোড়ায় রয়েছে অসংখ্য ইটের সংযোজন যা তৎকালীন অগণিত জনগণের ১১ দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তার উপরে ৬ কোণা বিশিষ্ট স্তম্ভ যা ১৯৬৬ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত ছয় দফার ইঙ্গিত বহন করে। তার উপরে ৩ কোণা বিশিষ্ট স্থম্ভ যা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ) মূলনীতি শিক্ষা শান্তি প্রগতি ও তার উপর মূল ১টি স্তম্ভ যা ছয় দফা/এগার দফার মূল দফা এক দফা বাংলার স্বাধীনতার স্মৃতি বহন করে। বলাবাহুল্য এমন অর্থবহ ও আকৃতিবিশিষ্ট শহীদ মিনার বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। এই শহীদ মিনার নির্মাণে যারা সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছাত্র সংসদের প্রো-ভিপি মোঃ মতিউর রহমান (বর্তমানে এ্যাডভোকেট), আমোদ প্রমোদ সম্পাদক মোঃ গোলাম হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক আমানুল্লাহ, সহক্রীড়া সম্পাদক মাহমুদ হাসান সিরাজি, সহসাহিত্য সম্পাদক সৈয়দ সালাহ উদ্দীন, শ্রেণি প্রতিনিধি রুহুল আমিন (প্রয়াত), ছাত্রনেতা সরকার আব্দুল খালেক দুলাল (প্রয়াত), মাহাবুব জামান ভুলু (বর্তমান রাজশাহী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান), ছাত্রনেতা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার এম পি সাবেক মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী, বেগম আখতার জাহান বর্তমান আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও ফিরোজা খানম

পলি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। শহীদ মিনার নির্মাণকালে আরও উপস্থিত ছিলেন সরদার আমজাদ হোসেন (সাবেক মন্ত্রী) ও রাজশাহী কলেজের সাবেক ভি পি মো: সাইফুল ইসলাম (সাবেক এম পি) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনার এর সাথে জড়িয়ে আছে জাতীয় ইতিহাস চেতনা ও বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের অম্লান স্মৃতি। তাই এটি শুধু রাজশাহীবাসী নয়, সমগ্র বাঙালির অহংকারের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত।

প্রাক্তন ছাত্রনেতা, রাজশাহী কলেজ

মামুন আলী

মাতৃভাষার সংগ্রাম ও অর্জন

ভাষা হল মানুষের মনের ভাব, মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার মাধ্যম। এর মাধ্যমেই মানুষ তার পরিকল্পনার কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। এক ভাষার লোক কখনও অন্য ভাষা দিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই প্রয়োজন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হচ্ছে মায়ের ভাষা। এ ভাষা শিখতে কখনও শিক্ষক লাগে না। মাতৃভাষার জন্য মা-ই যথেষ্ট। তাই মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করা মানে মাকে অস্বীকার করা। জন্মের পর মানুষ যে ভাষায় প্রথম কথা বলে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে এবং ভাষাজাত সাংস্কৃতিক আবহে সে বড় হয়ে ওঠে তাই মাতৃভাষা। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য মানুষের ভাব আদান-প্রদানে ভিন্নতা তৈরি করেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা পদ্ধতি চালু হয়েছে, এসেছে ভাষাগত বৈচিত্র্য। সুতরাং প্রত্যেক ভাষার মত বাংলা ভাষারও রয়েছে নিজস্বতা, আপন ঐতিহ্য। সে ঐতিহ্য অপরাপর সকল ভাষাকে পেছনে ফেলে পৌঁছে গেছে বিশ্বমানের পর্যায়ে।

স্বয়ং মহান আল্লাহ মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি সুরা ইবরাহিমের ৪ নং আয়াতে বলেন-"আমি প্রত্যেক রাসুলকে তাঁর লোকদের মাতৃভাষাতেই প্রেরণ করেছি।" হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর যে আসমানি কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন তা তাঁর মাতৃভাষা আরবিতে। হযরত দাউদ (আঃ) এর কাছে 'যাবুর' কিতাব তাঁর মাতৃভাষা ইউনানী ভাষায়; হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে 'তাওরাত' তাঁর মাতৃভাষা হিব্রু বা ইবরানী ভাষায়; হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাঁর মাতৃভাষা সুরিয়ানি ভাষায়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে মানব ইতিহাসে কোনো জাতি আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম ৯০০-৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাক না কেন, বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করে ১৮০০ সাল থেকে। ১৮০০ সালের পরে বাংলা ভাষাকে আমরা পরিণত অবস্থায় পাই। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে পাই আরও অনেক পরে । আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

১৯১১ সালে রংপুরে মুসলিম প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে এক প্রশ্নের জবাবে নবাব সৈয়দ আলী চৌধুরী বলেন, 'বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা।' তিনিই প্রথম ১৯২১ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে লিখিতভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে বলেন-"ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক না কেন একমাত্র বাংলা ভাষাকেই বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।" এরও আগে ১৯১৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিশ্বভারতীর এক সম্মেলনে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। ১৯৩৭ সালে মৌলানা আকরম খাঁ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জোর দাবি জানান। নবাব সৈয়দ আলী চৌধুরীর ব্যাপক প্রচারে বাঙালি হৃদয়ে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি বাংলার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতেই ১৯৪০ সালের পর থেকে বাংলা ভাষা স্কুলসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু হয়। ১৯৪৭ সালের ২৪ জুলাই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা শীর্ষক' এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-

"বিদেশি ভাষা হিসেবে যদি ইংরেজি বর্জনীয় হয় তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। উর্দুকে ২য় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি জানান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এর আগে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সভা-সমাবেশ করা হয়। ভাষার প্রশ্নে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাই ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ও ২৪ মার্চের ঢাকা সফরকালে তিনি ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার পর ছাত্রজনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ২৮ মার্চ আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার ঘোষণা দেয় সরকার। ২ এপ্রিল ১৯৪৮ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনিও ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণা ছাত্রসমাজকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এ ভাষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ছাত্র-ধর্মঘট পালিত হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ছাত্র-জনতা একযোগে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

তৎকালীন পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বানচাল করার জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা এক জরুরি বৈঠকে সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টার দিকে দশজনের একেকটি গ্রুপ হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এ শ্লোগান দিয়ে ভাষার দাবিতে পরিষদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য পুলিশ বাহিনী মাঠে নামে এবং তারা মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এতে শহীদ হন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না-জানা আরও অনেকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির রক্তপ্রবাহ যে অগ্নিশিখা হয়েছিল, তা দাবানল হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে সরকার শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

পৃথিবীতে বাংলাই একমাত্র ভাষা যা অর্জন করতে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছে। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেলেও আমাদের কাছে চরমভাবে অবহেলিত। ২১ ফেব্রুয়ারি আসলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, সেমিনার, বক্তৃতার শেষ থাকে না। কিন্তু এ ভাষা প্রসার-প্রচারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালে পিচ ঢালা রাস্তা রক্তরঞ্জিত হয়েছিল। এজন্য সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারদের মতো শহীদদের নাম শ্রদ্ধাভরে আমাদের স্মরণ করতে হয়। রক্তের বন্যায় রাজপথ প্লাবিত করে যে বাংলা ভাষাকে অর্জন করতে হল, সে ভাষাকে অনেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় উন্নীত করা হলেও বর্তমান প্রজন্ম বাংলাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করছে না। বাংলা ভাষার সঠিক চর্চায় তারা আগ্রহী হয় না। উচ্চারণবিকৃতি ও ইংরেজি শব্দের ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট করা হচ্ছে। তাই প্রয়োজন সঠিক উচ্চারণে যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।

৪র্থ বর্ষ সম্মান, বাংলা বিভাগ

কামরুল ইসলাম সাঈদ

একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের একটি বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। মায়ের মুখের ভাষার সতীত্ব রক্ষায় বাংলার অকুতোভয় সন্তানেরা আপন বুকের রক্তে পিচ ঢালা কালো রাস্তাকে রঞ্জিত করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। এই ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্দমনীয় সংকল্পের গভীরে প্রোথিত শেকড়ে রস সঞ্চার করে, দেশকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে গেছে। অমর একুশে তাই আমাদের জাতীয় জীবনে বেদনাবিজড়িত এক গৌরবগাঁথা। প্রতি বছর ভাষা আন্দোলনের বেদনা-বিধুর স্মৃতি ও সংগামী চেতনার অমিয় ধারাকে বহন করে একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের দ্বারে ফিরে আসে। জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাবার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। অতপর ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে এসে এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন 'Urdu and nothing but Urdu shall be the state language of Pakistan' এর তিনদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জোরের সাথে ঘোষণা করলে ছাত্রজনতা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৫০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন এই ঘোষণা দিলে ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়ে উঠে। এর প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র বাংলায় ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের কর্মসূচি প্রদান করলে ছাত্রজনতার মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে হাজার হাজার ছাত্রজনতা অংশ নেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তা উত্তাল জনসমুদ্রে রূপ ধারণ করে। মিছিলের ভয়াল রূপ দর্শন করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন আন্দোলনকারী ছাত্রজনতার উপর কাঁদুনে গ্যাসসহ গুলি করার নির্দেশ দেন। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম নাজানা আরও অনেকে। এতে সারা বাংলায় প্রতিবাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সমগ্র জাতি সম্মিলিতভাবে গর্জে ওঠে সিংহের মত। পরিশেষে শাসকগোষ্ঠী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেয়।

একুশের আন্দোলন যদিও একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল কিন্তু তা কেবল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সে আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও। বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম সফল সংগ্রাম হিসেবে পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই একুশের চেতনা বাঙালি জনমনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর থেকে বাংলার জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল মিষ্টি কথায় অধিকার আদায় হয় না। এর জন্য রক্ত ঝরাতে হয়। পরবর্তীতে এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ বাংলার জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে-'২১শে ফেব্রুয়ারি কোনো বিশেষ দিনক্ষণ বা তিথি নয়; একটি জাতির জীবন্ত ইতিহাস। এ ইতিহাস অগ্নিগর্ভ। মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকে বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। আব্দুল গাফফার চৌধুরীর অনন্য গান: 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।'

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর শুধু আমাদের মাতৃভাষা দিবস নয়। প্রতি বছর এ দিবসটি সারা বিশ্বে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (UNESCO) এর সাধারণ পরিষদের ৩০ তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে সর্বসম্মতভাবে '২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কোর ১৮৮টি সদস্য দেশ এবং ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য হল- সকল মাতৃভাষাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া, যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, দুর্বল বলে কোনো ভাষার উপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করা, ছোট-বড় সকল ভাষার প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন করা। বাঙালি জাতি নিজের রক্ত দিয়ে সারা বিশ্বকে শিখিয়ে দিয়ে গেল ভাষাকে ভালবাসার মন্ত্র। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ইতিহাসে আপোষহীন সংগ্রাম ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। একুশ হোক জগতে সকল অনৈক্য, সংঘাত ও অশান্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হাতিয়ার। হোক সমুদ্রপথের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতের আশার প্রদীপ দিক নির্দেশক আলোকবর্তিকা।

শিক্ষার্থী, রাজশাহী কলেজ

আব্দুন নুর আল হাসান

তুমি পারবেই

জীবনের মহিমা বুঝা সত্যিই কষ্টকর। আর এটাই হল মজার ব্যাপার। জীবন কী? এটা বুঝতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শেখার শেষ নেই, চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখিন হতে হয়। জীবনে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই প্রতিটি জীবনসচেতন মানুষকে দায়িত্বশীল হওয়া উচিৎ। গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায় আমার নিজের উপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিভিন্ন বাধার সম্মুখিন হতে পার কিন্তু থেমে যেও না। তুমি তোমার দ্বায়িত্ব পালন কর। তুমি তোমার মত হও। তোমাকে তোমর মত করে প্রতিষ্ঠা কর। আমি জানি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাধনা লাগে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। তোমাকে তুমি যেভাবে ভাব অন্যেরা তোমার মত করে নাও ভাবতে পারে, তাই বলে থেমে যাবে? কখনই না। ব্যক্তি, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বা সমাজের সামান্য ধিক্কারে আমরা থেমে যাই। মূলত এটাই আমার বড় সমস্যা। আমাদের চারপাশের আরও একটা বড় সমস্যা হচ্ছে- তুমি যেটা ইতিবাচক বলে মনে কর, আমাদের সমাজ তথা সমাজের কিছু ব্যক্তি সেটা মেনে নিতে পারে না বরং তারা ছুড়ে ফেলতে চায়। একটা কথা সবার মনে রাখা জরুরি, তা হল জীবনের উত্থান পতন স্বাভাবিক। কে কী করল বা কে কী বলল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের মতে কাজ করে যাওয়া উচিৎ। জীবনযুদ্ধে হোচট খেয়ে পড়তে নয় দৌঁড়াতে শেখো। তাহলেই তুমি জয়ী। তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর, তুমি যেটা করতে যাচ্ছ সেটা তোমার মনে লালন কর কি-না। যদি তোমার লক্ষ্য অটুট থাকে, তবে একদিন না একদিন তুমি জিতবেই। আর যদি অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তোমার পরাজয় অস্বাভাবিক নয। তোমার স্বপ্ন তুমি নিজেই দেখ, তোমার ইচ্ছা, তোমার চাওয়া-পাওয়া, তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই না্ও। তোমার চলার পথের কাঁটা তুমি নিজেই সরাও। তোমার চাওয়া-পাওয়া, তোমার স্বপ্ন তুমি নিজের মত করে সাজাও। তোমার সাধনা, তোমার কল্পনা, তোমার শ্রম, তোমার ইচ্ছাশক্তি তোমাকে তোমার গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

অন্যের ওপর নির্ভর করা আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা একই কথা। আত্ম নির্ভরশীল হও, নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে কর, তাহলে তোমার স্বপ্ন, তোমার সাধনা, তোমার চাওয়া-পাওয়া, তোমার ইচ্ছেগুলো তোমার কাছে ধরা দিতে বাধ্য। তোমার বংশ পরিচয় কী? তোমার দাদা, বাবা কে? মামা, খালু কী করে? সেটা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তুমি কী কর? তোমার আচার আচরণ কেমন? তোমার কী আছে? তুমি কী করতে পারো সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন কিছু করতে গেলে বাধার মুখে পড়তেই হয়। তবে মনোবল দৃঢ় করে সব বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে যাবার নিরলস প্রচেষ্টা করলে অবশ্যই সফলতা আসে। শুরুতে বলেছি জন্ম থেকে মুত্যু পর্যন্ত শেখার শেষ নেই। সত্যি বলতে কী বিচিত্র পৃথিবীটা কঠিন পরীক্ষার। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, সবাইকে তোমার পাশে পাবে। কিন্তু ব্যর্থ হও সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। যদি তুমি সফল মানুষের তালিকায় তোমাকে দেখতে চাও, প্রতিবন্ধকতাকে ভয় না করে এগিয়ে চল, সফল তুমি হবেই। জীবনে চলতে গেলে বাধা আসবেই, বাধা হচ্ছে চলার পথে গতিরোধক। কিন্তু গতিরোধকের কারণে জীবন থেমে যাবে এমনটি হতে পারে না। মনোবল দৃঢ় কর, লক্ষ্যে স্থির থাক, দেখবে একদিন তুমি পারবেই।

২য় বর্ষ সম্মান, বাংলা বিভাগ

মো. বখতিয়ার হোসেন

একুশের চাওয়া

"উঠিয়ে ভাইয়া, সুবাহ হো চুকাহে!" ছোট বোনের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। শরীরটা একটু খারাপ। জ্বর-জ্বর ভাব হচ্ছে। উঠতে পারছি না। হাত মুখ ধুয়ে এসে বন্ধুকে ফোন করলাম। বললাম শরীর খারাপ, আমার পক্ষে আজ প্রভাতফেরিতে যাওয়া সম্ভব না। বন্ধু এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানালো যেন, যেন আমি অতি গর্হিত কোন কথা বলে ফেলেছি। বলল- "গুড, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি! প্রভাতফেরিতে না গেলে ফ্রেন্ড সার্কেলে মুখ দেখাবি কেমনে? তার উপর বহু মাইয়া যাইতেছে, তাড়াতাড়ি রেডি হ।"

ফোন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। এই এখন আমাদের একুশ নিয়ে ভাবনা। একুশের চেতনা এখন কেবল বছর অন্তর মুখস্থ করে রচনা লেখা, লোক দেখানো, মেয়ে দেখার জন্য প্রভতিফেরিতে যাওয়া আর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার মধ্যই সীমাবদ্ধ। সকালবেলা এখন ঘুম ভাঙ্গে ডোরেমনের চেঁচামেচিতে আর রাত্রিবেলা ঘুমোতে হয় হিন্দি সিরিয়ালের ন্যাকামিতে। সারাদিন তো আছেই এফ এম রেডিওর কান ঝালাপালা করা বকবকানি। ভাষার মাস, অনেক রেডিও চ্যানেলে তাই হিন্দি ও ইংলিশ গান বন্ধ। কে জানে, হয়ত নতুন মাস উদযাপনই করা হবে ঝাকানাকা কোন হিন্দি বা ইংলিশ গানে।

আমি শুচিবায়ুগ্রস্ত নই, কথার মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ ব্যাবহার করা যাবে না এমনটা বলছি না। বিদেশি শব্দ না থাকলে কোনো ভাষাই সমৃদ্ধ হতে পারে না। আমার ক্ষোভ কথার মধ্যে অনর্থক ইংরেজি ব্যবহার করে জগাখিচুড়ি বানানোয়। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম একেই রূচিশীলতার পরিচায়ক মনে করেছে। কেউ যুগের হাওয়ায় গা
ভাসাতে না পারলে অনেকের কাছে তার পরিচয় দাঁড়ায় অসংস্কৃত বা গেঁয়ো। ব্যাপক বিকৃতির মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছি। তাই আমার মনে প্রশ্ন জাগে –এ ভাষার জন্য কি আমার পূর্বপুরুষেরা আন্দোলন করেছিল? এ বাংলার দাবিতে জীবন দিয়েছিল? ভাগ্যিস ভাষাশহীদগণ বেশিরভাগই এখন বেঁচে নেই। থাকলে আমরা মানুষ হিসেবে তাদের মুখ দেখাতে পারতাম না।

বর্তমান সময়ের যোগাযোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ফেসবুক। আমরা ভাষা সচেতন হলে বাংলা ভাষার বিস্তারে এ আধুনিক সুযোগটি কাজে লাগাতে পারি। তাই আসুন, মাতৃভাষাকে ভালবেসে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করি।

একাদশ, বিজ্ঞান, রোল-১২২

আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ

একুশের গান

একুশ আমার হৃদয়ের ভাষা
কথা বলে শিশু শৈশবে
মায়ের কোলের আদর–স্নেহে
সে ভাষায় লিখি কৈশোরে।

ফাগুনের বনে বৃক্ষ-লতায়
ফুটেছে কুসুম পাতায় পাতায়
তাদেরও কথা বাংলা ভাষায়
বাজে সে নূপুর সৌরভে।

কৃষকের ক্ষেতে চলে যে লাঙল
কুলি-মজুরের হাতের হাতল
জ্ঞানী-গুণীদের ধারালো কলম
এক হয়ে চলে গৌরবে।

ক্যাম্পে

গেরিলা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা
শপথ নিয়েছে মরণপণ
রাতের আঁধারে রাইফেল কাঁধে
সৃষ্টি করেছে রণাঙ্গন।

বাংলার বায়ু বাংলার মাটি
মায়ের মতোই কতো যে খাঁটি
সে মায়ের যারা সম্ভ্রম লোটে
প্রতিশোধ নেবে বীর জোয়ান

ভয়ে কাঁপে ঐ শত্রু সেনারা
খুঁজেও পায় না কূলের কিনারা
ঘাত খেয়ে মরে মাঠে-প্রান্তরে
বজ্র-গরজে বাজে স্বনন

ব্যথা-বঞ্চনা শোক-তাপগুলি
ক্ষোভ হয়ে বাজে, দেশ গড়ে তুলি
নারী-পুরুষ বা ধনী-দরিদ্র
সবাই মোদের আপনজন

প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ

কামরুজ্জামান গোপন

অনিরুদ্ধ একুশ

একা আকাশের সন্ধ্যায়
নীল পাতা জুড়ে খচিত হয়
একটি একটি করে নক্ষত্র
অজস্র অক্ষরের চোখ-
খুঁজে ফেরে বায়ান্নর রাজপথ
প্রাণের স্মৃতিস্তম্ভ
রাজশাহী কলেজের
রক্তাক্ত হৃদয়ে,
ঢাকা মেডিকেলের
শোকার্ত প্রাঙ্গণে-

আজ কেউ কাঁদে না
কাঁদে না বাংলাদেশ-
শিমুলের রক্তের উষ্ণতায়
পলাশের অগ্নি দহনে
ফাঁসির দাবি নিয়ে চিরকাল
লাল সবুজের মহাকাব্যিক উত্থানে
একুশ এক শাশ্বত মন্ত্র-

নক্ষত্র অক্ষর আজ
আকাশ থেকে নদী
নদী থেকে হৃদয়
চেতনার মহাজাগতিক সৌধে
অনিরুদ্ধ আলোকের
স্বর্ণালী পায়রার ঝাঁক
বর্ণমালার কবিতা লিখে যায়
অরুণাভ আকাশে
গাঢ় সবুজের পটভূমিকায়–

সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

জলিল আহমেদ

শাহবাগ আমাকে বাধ্য করেছে

এখানে এখন রোদ
শাহাবাগে ফাগুনের আগুন।
চল্লিশ পেরিয়ে গেল রোদ দেখি নি
ফাগুন দেখি নি কোথাও।
ছিল শুধুই অন্ধকার
বার্ধক্যের কানাকানি।
আকাশে শুধুই মেঘ জমেছে
বৃষ্টি ঝরে নি, আগুন ঝরে নি।

এখানে এখন রোদ
শহীদ মিনারে ফাগুনের আগুন।
চল্লিশ পেরিয়ে গেল স্রোত দেখি নি
নদী দেখি নি কোথাও।
ছিল শুধুই খরা, পাতা ঝরা
সুবিধার দরকষাকষি।
আকাশে শুধুই কুয়াশা জমেছে
জোছ্না ঝরে নি, আগুন ঝরে নি।

এখানে এখন রোদ
ফেসবুকে ফাগুনের আগুন।
চল্লিশ পেরিয়ে গেল বন্ধু দেখি নি
শৃঙ্খলিত নেট দেখি নি কোথাও।
ছিল শুধুই দীর্ঘশ্বাস
হতাশার হাতছানি।
আকাশে শুধুই ধোঁয়াশা জমেছে
শ্লোগান ঝরে নি, আগুন ঝরে নি।

এখানে এখন রোদ
গণমাধ্যমে ফাগুনের আগুন।
চল্লিশ পেরিয়ে গেল সংবাদ দেখি নি

নবযুগ দেখি নি কোথাও।
ছিল শুধুই বিজ্ঞাপন
বিতর্কের ভাষণ।
আকাশে শুধুই এসএমএস জমেছে
ধুমকেতু ঝরে নি। আগুন ঝরে নি।

এখানে এখন রোদ
প্রজন্ম চত্বরে ফাগুনের আগুন।
চল্লিশ পেরিয়ে গেল তারুণ্য দেখি নি
গণজাগরণ দেখি নি কোথাও।
ছিল শুধুই বিনোদন
ভিনদেশী আমন্ত্রণ।
আকাশে শুধুই গোধূলির রঙ
রক্ত ঝরে নি। আগুন ঝরে নি।

এই 'ফাগুনটা সত্যিই দস্যি মাস'।
সবখানে এখন রোদ, ফাগুনের আগুন।
চল্লিশ পেরিয়ে দেখলাম আপন সত্তাকে
আমার স্বপ্নকে।
'অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মতো
সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ।'

চলে এসো তুমি ভোরের প্রতীক্ষার মতো
নদীর স্রোতের মতো
প্রথম বৃষ্টিপাতের মতো।
সমস্ত রোদ দিয়ে ঢেকে দাও আমার শরীর
শিরায় শিরায় বয়ে যাক প্রজন্মের এই রক্তধারা।
তোমার মধ্যে অনন্তকাল
বসবাস করব আমি
দ্রোহ হয়ে
সুখের নাগরদোলায় এইভাবে অনেকদিন।

সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর

মোস্তফা আহাদ তালুকদার

বেপার

ভাষা নিয়ে চলছে সর্বত্র এক অশুভ বেপার
বাংলাও হয়েছে আজ–
বিশ্ববেনিয়া-শকুনীর হিংস্র শিকার।
কী এক অদ্ভুত লাভের নেশায়
ইঙ্গ-হিন্দিতে কথা বলছি সবাই।
ভুলে গেছি আব্দুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী'
এফ এম রেডিওর হাতছানি সর্বত্র।
হিন্দি চ্যানেলগুলো গোখরার ফণা তুলে
ছাড়ছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
বিকৃতির নীল বিষে নীলকণ্ঠ
দুঃখিনী বাংলার আকাশ বাতাস।
ফ্যাশনের ধুয়া তুলে
প্রজন্মের এ কোন খেলা!
রফিক-সালামের পুণ্যভূমি
যেন ভাষা-অনাচারের উন্মুক্ত মেলা।
প্রজন্ম একুশ শতক
ভুলে গেছ শহীদের রক্তের দাগ,
চেতনার কোনোস্থানে নেই
একুশের কৃষ্ণচূড়ার কোনো রক্তভাগ।
বঙ্গ-মাকে ভুলে গিয়ে ইঙ্গ-মায়ের পদ চুমি,
লাভের কড়ি গুনছ তুমি,
ধিক্কার এ মানসিকতার।
চাই না এ বাণিজ্য আর
ভাষা নিয়ে অশুভ সব কারবার।
চেতনার নাড়া চাই
শেকড়ের টান চাই,
চাই আর একটি
ভাষাশুদ্ধির আন্দোলন দুর্বার।

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
সরকারি আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া

মোঃ রবিউল ইসলাম

একুশের প্রাণ

সেদিন বিকেলে পেলাম খবরটা
কারা যেন পিটিয়ে আহত করেছে
আত্মার একুশকে।
ছুটে যাই এক বুক বিষণ্নতা সাথে করে,
দেখি, হাসপাতালের মলিন বিছানায়
শুয়ে আছে স্বপ্নের বাংলাদেশ আমার।

চোখে অশ্রু নেই, চাহনিতে নেই
কোনো চিন্তার দাগ–
শুধু ক্রোধ আর ঘৃণার উন্মত্ত ছুটাছুটি।
সুদিনের সাথি আজ কেউ নেই পাশে,
শুধু বিকেলের একটুকরো আলো
চেয়ে থাকে হাসিমুখে।
বিমর্ষ বিকেল যেন দাঁড়ানো ডানপাশে,
আমি নীরবে দাঁড়ালাম একুশের পাশে
অভিযুক্ত আসামির মত।
তাকাই গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে,
তাকাতে পারি না, ম্রিয়মাণ শোকে
ভারি হয়ে ওঠে আমার বুক।

অভিমানী অশ্রু পরাজিত হয়
ঘৃণার মিছিলে।
ভাবি অবলীলায়, এ কি, হায়!
অমৃত একুশ কেন কেনা-বেচা হয়?
অথচ একুশের অমরত্ব নিয়ে
কেউ কোনোদিন প্রশ্ন তুলবে, এমন
চিন্তাকে ভুলেও প্রশ্রয় দিই নি কখনও।
কেননা, 'বাঙালির রক্তের রঙ কেমন'-
এ প্রশ্ন কি প্রাসঙ্গিক হয় একুশ প্রান্তরে?
তবে এত আয়োজন করে
একুশ অবমাননার কী প্রয়োজন?
একুশের প্রাণ কেড়ে নিতে
এ কাহার উদ্যত অসি?
একুশের গালে এ কেমন বলিরেখা,
একুশের চুলে কপোল কপালে
ঝুলিতেছে কেন বিরহী বাদুড়?
জেনে রেখো, আমিও জানি এ কথা–
চির অম্লান একুশের গান, একদিন
বাংলার কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করে
অঙ্কুরিত হবে কোটি কোটি একুশের প্রাণ।

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

গোবিন্দ কুমার সাহা

জীবন নদীর বাঁকে

জীবন নদীর বাঁকে
দেখা হয় ফিরে ফিরে
দুঃখ-দুর্দশা-ছলনার সাথে।

কখনো বা প্রবল রোদ্দুর
কখনো বা অবিরাম বর্ষণ,
অবিশ্রাম ধারায় সিক্ত করি দেহ-মন।

অবিরাম জলধারা আমাকে ক্লান্ত করে,
হাড়ে কাঁপন ধরায় মাঘের শীত।
কখনো আপাদমস্তক কাদা গায়ে মেখে
জীবন ছুটে চলে নিরন্তর।

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, সমাজকর্ম

সুমন সৌপর্ণ্য

ভিন্নগ্রহী

আলোর নিচেও নিজেকে
অন্ধকারময় মনে হয় সারাদিন।
সারাবেলা এপাশ-ওপাশ
এপথ-ওপথ উল্টে-পাল্টে
আঁকতে পারি না প্রিয় কোনো মুখ।

কেবল রূপালি নগরের মতো
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির অসুখ কাতরায়
আমি আর অমিল,
একসাথে শুই
একসাথে জন্ম দিই কাতরতা।

আর ভাবনার সুদিন
নোঙ্গর তুলে পাড়ি দেয়
অন্য গ্রহে, অন্য কোনোখানে।
যেখানে কপোত-কপোতিরা
আলোর অশ্রয়ে বাঁচে।

শিক্ষার্থী, ৪র্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ

তৌহিদ ইমাম

স্বপ্ন যখন আততায়ী

স্বপ্নের মধ্যে প্রতিদিন খুন হয়ে যায় সে

এলোমেলো, ভবঘুরে, বাউণ্ডেলে–
নিরন্তর উদ্দেশ্যহীন সবগুলো রাজপথ,
গলি-ঘুপচি আর অন্ধ নর্দমার ঘ্রাণ
সারাদিন ধরে বয়ে বয়ে
বাড়ি ফিরে গভীর রাত্রিতে
ঢলে পড়ে অবসাদে কাতর যুবক

এরপর সার্চলাইটের দ্রুত আলো
ফেলতে ফেলতে হানা দেয়
দুঃস্বপ্নের কিরিচ
ঝলসে দেয় বোধের প্রান্তর
বোধহীন যুবকের অস্থি-মজ্জায়
আর অন্তর্লীন চেতনায়
আমূল বিঁধিয়ে দেয় হতবাক হারপুন
দুঃস্বপ্নের কিরিচ অন্তর্হিত হবার পর
যে যুবক জেগে ওঠে,
সে পুরোপুরি বোধশূন্য

তারপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাজপথ,
গলি-ঘুপচি আর অন্ধ নর্দমায়
বোধ খুঁটে খুঁটে তেজস্ক্রিয় নখে ও ঠোঁটে
ঢলে পড়ে আবার
আবারও বোধহীন হয়

স্বপ্নের মধ্যে প্রতিদিন
এভাবেই খুন হয়ে যায় সে

খালেদ মাহমুদ আকাশ

দ্বিধা

সাগরের মতো ফেঁপে ফেঁপে ওঠে
উন্মাদের মতো চুল ঝাঁকড়ায়, লাভ কই?
সে তো শুধু জমাট রক্তের মতো
না পারে এগুতে না পারে পিছুতে
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণা
সূর্যের রৌদ্রের তাপে ঝলসায়
আবার কখনও তুষার জমা পাহাড়
কী খেয়ালি মন
মচকে যায়, কিন্তু ভাঙ্গে না।

কখনও মরা শুষ্ক পাতা
মড়মড়িয়ে ওঠে
দেখে, কিন্তু বোঝে না
কিন্তু পাতা থেকে অঙ্কুর হলেই বিপদ
সবাই হকচকিয়ে ওঠে
তাতে দোষ নেই
কী খেয়ালি মন, কী পাগলামি!
রৌদ্রে ঝলসে যায়
আবার বর্ষণেই নিথর
পথ পায় না;
পেলেও চোরাবালি।

শিক্ষার্থী (মানবিক), রাজশাহী কলেজ

নাসিফ-ই-আনোয়ার

জলছবির খাতা

দিনের আলোয় দেখি সফলতার চাবিকাঠি
দেয়ালের পর দেয়াল জুড়ে মানুষের প্রতিবিম্ব।
একই সমান্তরালে সকলে দাঁড়িয়ে,
চিৎকার- 'দাও আমায় দাও'
বিভ্রান্ত মহাকাল থমকে দাঁড়ায়
ক্রুর হাসিতে চেয়ে থাকে অপলক
তবু অজস্র মায়ের ক্রন্দন,
জীবিত থাকলেই হলো তার দেহ,
হোক না প্রাণহীন সত্তা।

রাতের আঁধার নিঃশব্দ আকাশে
যখন কষ্টগুলো কুয়াশাবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে,
চোখ যখন অন্ধকারে সয়ে যায় না
যেখানে দেখা যায় ঝাপসা কিছু অতিমানব
তারা পথ রচনা করেছে,
সে পথে হাঁটার অনন্ত চেষ্টা আমাদের
মুছে যায় আপন সত্তা।
তবু একহাত ধরে আজ বাস্তবতার দেয়াল
অন্য হাতে এই জলছবির খাতা।

একাদশ-বি, রোল- ২৩৮

সোহেলী শবনম চৈতী

প্রেমিকার প্রেমের ফ্রেমে আঁকা মাতৃভাষা

প্রিয়ার শাড়ির আঁচল লাল রঙে রাঙ্গাও তুমি
জানো নাকি! ঐ লালেই কিনতে হয়েছিল এই মাতৃভূমি
প্রেমময়ী কোনো মায়াবি বিকেলে প্রিয়ার চোখে চেয়ে হাসা
জানো নাকি! কত মায়ের চোখের জলে ধুয়ে এসেছে মাতৃভাষা।

সমুদ্রের জলে সূর্যের লাল আলোতে কর সূর্যস্নান
সমুদ্রের লালে ভেসে গেছে অনেক টাটকা তরুণ প্রাণ।
বৃষ্টি দেখে মনে জাগাও সতেজ কোনো সুখ
বৃষ্টি অঝোরে সেদিনও ঝরেছে, রক্তে ভেসেছে মুখ।
প্রেমিকার হাত মুঠোয় নিয়ে হাঁটো রাস্তার ঐ ধারে
সেদিন তারা প্রাণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এই ভাষার তরে
প্রেমকে বাঁচাবে বলে বারবার কর শপথ
শত্রুরা শেষে পিছু হটেছিল দেখে এ ভাষার দাপট।

সব ভালোটুকু প্রিয়াকে না বেসে
একটু তুমি দাঁড়াও এ দেশের পাশে এসে
দেখ, তোমার এতটুকুন প্রেম নিয়ে
কতখানি যায় এগিয়ে যায় স্বদেশ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ, রোল-২৯৪৭

মোসাঃ জান্নাত

ভাষার জন্য আত্মত্যাগ

মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে
লাখে শহীদের প্রাণ
তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে
পেয়েছি এ বাংলার মাটি
গেছে অনেক মা বোনের সম্মান।

বাংলা মায়ের প্রাণের ভাষা
বাংলা ভাষা বলি তাই
বাংলা ভাষা অম্ল-মধু
না বুঝতাম আগে কভু।

২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে
বাংলার দামাল সন্তানের
বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে,
কতো মায়ের কোল উজাড় করে
ছিনিয়ে নিল আমার ভাষা।

তাঁদের আত্মত্যাগ স্মরণ করেই
বাংলা ভাষার সম্মান
রক্ষা করাই আমাদের সংগ্রাম।
আমি গর্বিত জন্মেছি বাংলা মায়ের কোলে
আমি গর্বিত আমি বাঙ্গালি বলে।

একাদশ, মানবিক

মোসাঃ মাহবুবা আলম মোস্তারী

পাখিগুলো

পাখিগুলো মগডালে গায় বসে গান
শুনে শুনে অবারিত নেচে উঠে প্রাণ।
কত সুনিবিড় ওরা, কত যে আপন
মুখরিত কলতানে, অলীক স্বপন।
প্রণয়ের সুরে ওরা প্রাণের খেয়ায়
দল বেঁধে দিগন্তে উড়ে উড়ে যায়।
কখনো বা নিকুঞ্জে ক্ষণে গেহ ঢালে
কুমুদির মুখ ছুঁয়ে উড়ে বসে ডালে।

নাচে ওরা গায় গান জানে বনবিথী
ওদের প্রণয় ডোরে জাগে কত স্মৃতি।
হায় রে মানবমন শুধু হাহাকার
জীবনের চারিদিকে প্রলয়ের তার।

চাওয়া না পাওয়ার ঘাতে ভুলে যাই সুর
সুরেলা বাঁশরী বাজে বেদনা বিধুর।
ব্যথিত স্বপ্নগুলো মিশে যেতে চায়
বিহগী পাখায় কোন দূর নীলিমায়।

হঠাৎ প্রশ্নগুলো দল বেঁধে আসে
ওরাও প্রশ্ন হয়ে ফিরে দুঃশ্বাসে।

অনার্স ২য় বর্ষ, বাংলা

মোছাঃ হাফিজা খাতুন হ্যাপি

একাকী বিকেল

নীরব শান্ত দ্বীপে
জনমানবহীন পড়ন্ত বিকেলে
আমি আছি শুধু বসে
তোমারই অপেক্ষায় ।

আকাশের নীল মিশেছে জলে
প্রজাপতিরা ছুটছে ফুলে দলে দলে
পাখিরা গাইছে গান মিষ্টি মধুর সুরে।
হৃদয় মোর নাচে তরঙ্গের তালে তালে
একাকী বিকেলে।

চাঁদ ভালোবেসে দূরে রাখে
রাতের মিষ্টি আঁধারকে,
দিনমণি সকালেই তার
প্রভাব বিস্তার করে।

আমি ভালোবেসে চাইব তোমাকে
একান্ত আপন করে।
চলো শুধু একবার
প্রবহমান ঝর্ণাধারায়
যেখানে দেখেছি তোমায়
সেই একাকী বিকেলে।

অনার্স ২য় বর্ষ, বাংলা।

আশরাফুল ইসলাম অনু

বাংলা আমার মা

বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা আমার মা।
বাংলা মায়ের স্মৃতির কথা
হৃদয়ে মোর থাকবে গাঁথা,
যেথায় আছে হাজার নদী
আছে হাজার গাঁ।

এই দেশেতে জন্মে আমার
জীবন হল ধন্য,
তোমার কোলে বাঁচতে পারি
মরতে তোমার জন্য।

ভোর বেলাতে ঘুম ভাঙিলে
শুনি পাখির গান,
এই দেশেরই আলো বাতাস
জুড়াই আমার প্রাণ।

বাংলা আমার ভাষা জানি
জন্মেছি এই বঙ্গে,
বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা
সইবে না এই অঙ্গে।

অনার্স ২য় বর্ষ, বাংলা

খন্দকার খাদিজা ইয়াসমিন

কল্পনার দেশ

যেই দেশে আছে নদী
ইচ্ছে করে সেথায় থাকি,
যেই দেশেতে হাজার পাহাড়
ইচ্ছে করে সেথায় যাবার।

নয়ন যেথায় স্বপন দেখে
আমি সেথায় চাইছি ঠাঁই,
পা ছড়িয়ে বসে যেথায়
মধুমাখা শান্তি পাই,
ইচ্ছে করে ডানা মেলে
সেই দেশেতে উড়ে যাই।

অপরূপা শোভা যেথায়
মন যে তাহার পরশ চায়,
নয়ন ছুটে সেই দেশেতে
যেথায় চেনা মানুষ নাই।

একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা

মোঃ রাশেদুল হক নিপু

স্মৃতির দোলা

মাচায় তোলা অনেক খবর
অনেক কালের নানান কথা,
কেউ শোনে নি, কেউ বোঝে নি
নিত্য নতুন বুকের ব্যথা।

মনের গোপন ভাঁজে ভাঁজে
কষ্টগুলো রাখছি তুলে
কেউ দেখে নি, কেউ বোঝে নি,
কষ্টে এ বুক উঠছে দুলে।

অনেক কালের অনেক স্মৃতি
অন্তরে আজ গাঁথা,
ফুরোবে না এই ডায়েরির
পরিপূর্ণ পাতা।

একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা

মনিকা পাল

বীর শহীদ যোদ্ধা

হে বীর শহীদ যোদ্ধা!
তোমাদের জন্য পেয়েছি
স্বাধীন সোনার বাংলা।
কত ভাই-বোন-মা
দিয়েছে জীবন বিসর্জন।
আমরা কি পেরেছি
তাদের মূল্য দিতে?
চারিদিকে আজ দ্বন্দ্ব, কলহ
জ্বলছে হিংসার আগুন,
আসেনা কেউ আগুন নেভাতে
ভাবে শুধু স্বার্থের কথা।

ফিরে চায় না তাদের পানে
যারা পড়ে থাকে ধুলিমাঝে।
অবহেলায়, অনাহারে
কেঁদে মরে যারা -
নাই কেহ চাহিবার।

হে বীর, হে শহীদ যোদ্ধা,
আবার এসো এই দেশে,
প্রেরণা দিতে, যেন আমরাও পারি
তোমাদের মতো হতে।

তোমাদের পবিত্র সংগ্রামের ফসল
বাংলাদেশ আর স্বাধীনতা,
অজর অমর অক্ষয়-চিরকাল।

অনার্স ২য় বর্ষ, বাংলা

অপেক্ষা সাহা

কেন এত ব্যবধান

আজও তারা জ্বলে, চাঁদ দেয় আলো
ওরা আছে মিলেমিশে।
আজও নদী মিশে যায় সাগরে,
ওরা আছে একসাথে।
শুধু তুমি আর আমি রয়েছি অনেক দূরে
বিশাল ব্যবধানে।

আজও কুয়াশা নামে কাশবনে
সিক্ত করে আবেগের জলে।
আজও ক্লান্তি ছেড়ে অন্ধকার দূর করে-
জোনাকিরা সারারাত জেগে।
শুধু তুমি আর আমি রয়েছি অনেক দূরে
বিশাল ব্যবধানে।

আজও বৃষ্টি ঝরে মাটির বুকে
সকাল বিকাল সাঁঝে,
আজও রঙধনু ছড়ায় রঙ
মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে।
শুধু তুমি আর আমি রয়েছি অনেক দূরে
কেন এত ব্যবধান আজ দু'জনে।

সমাজকর্ম বিভাগ

মোসাঃ নীলিমা হাসনাত

স্বপ্ন

আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি।
তাই ভাবি, কবে দেখতে পাবো
আমার সোনার বাংলাদেশে
নেই কোনো হাহাকার।
নেই গরিবের চোখে জল।
পথশিশুরা হাসছে
আর বই নিয়ে যাচ্ছে স্কুলে।

কখনো কি সত্যি হবে
আমার এই স্বপ্ন?
আমার অনুভব সত্যি হবে তো–
যখন মায়ের চোখে থাকবে না
সন্তান হারানোর অশ্রু।

আমার মা-বোনের জন্য
এই দেশ হবে নিরাপদ আশ্রয়।
দেশ হবে সন্ত্রাস আর দুর্নীতিমুক্ত।
আমার এ স্বপ্ন হয়ত একদিন সফল হবে,
তাই আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান আমি।

একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা

মাহমুদা খাতুন মিলি

একুশের আগমনী বার্তা

আজকের সূর্যটা যেন একটু বেশিই উজ্জ্বল
লোহিতবর্ণ সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় আমার চোখে।
আমি আলোড়িত হই সূর্যের আলোতে।

সূর্যটা ক্রমেই হতে থাকে লোহিত থেকে লোহিততর।
ভাবি, আমি উদ্বিগ্নতায়
একি শুধুই রঙ, নাকি আমার কল্পনা?

হঠাৎ শীতল এক স্রোত বয়ে যায়
আমার হৃদয় মাঝে।
পাখির গান, ফুলের সুবাস
সবকিছুই যেন আজ ভিন্ন প্রকৃতির।

রাজপথে নামে মানুষের ঢল
স্রোত ভেদ করে ভেসে আসে কানে-
আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।
বুঝলাম কেন এত লাল
আজকের সূর্যটা।

একাদশ ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৪২০

প্রীতম কুমার পাল

অদেখা চিরচেনা ৫২

আমি বায়ান্ন দেখি নি
আমার ভায়ের রাস্তায় লুটিয়ে পড়া
রক্তমাখা শরীর দেখি নি।

আমি জনস্রোতের মিছিলে যাই নি
প্ল্যাকার্ড হাতে
বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান দিই নি।

কিন্তু স্বপ্নে দেখি আমি
শ্লোগানমুখর মিছিল আর জনজোয়ার।
আকাশে বাতাসে তখন
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

একাদশ বিজ্ঞান, রোল:১৩৩

ইসরাত জাহান

আমাদের একুশ

বায়ান্নর একুশ দেখি নি
কেবল শুনেছি
এ দেশে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে।

মা, তোমায় ডাকছি পরাণ ভরে
তোমার শেখানো ভাষায় কথা বলছি আমি।
একুশ এলেই কেন জানি
শরীরে জাগে কেমন উষ্ণতা।

রাজপথ রক্তে রঙিন করেছে যে সৈনিক
তোমাদের বংশধর ভেবে
নিজেকে নিয়ে গর্বিত হই।
তোমরাই শিখিয়েছে দেশের জন্য
জীবন উৎসর্গ করতে।

তাই ভুলি নাই তোমাদের
আছ রক্তকণিকায় উদ্দীপনা হয়ে।

একাদশ মানবিক

মোস্তাকুর রহমান

একুশের গল্প

৫২'র সেই স্মরণীয় দিনে
বিক্ষুব্ধ জনতার রক্তক্ষরণে,
পথে পথে জনতার ভীড়
ছিল গর্বিত শির।

৫২'র সেই স্মরণীয় দিনে
গেয়েছিল তারা বাংলার জয়গান
চেয়েছিল তারা বাংলা ভাষার সম্মান।

৫২'র সেই স্মরণীয় দিনে
একত্রিত হয়েছিল একই মন্ত্রধ্বনিতে।
হাতে নিয়ে পোস্টার আর প্ল্যাকার্ড
করেছিল জনতা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।
সংগ্রামী চেতনায় ভেসে যায়
বাংলার নদী মাঠ আর পথ-ঘাট-গ্রাম।

৫২'র সেই স্মরণীয় দিনে
চারিদিক মুখরিত হয়েছিল
বিদ্রোহের দাবানলে।
মাঠের সবুজ ঘাস সেদিন লাল হয়েছিল
বাংলা ভাষা নিয়ে আসে এক নতুন সকাল।
অনেক সংগ্রামের ফসল এই বাংলা ভাষা
ভুলে যেতে পারি কি কখনো?

একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৬৫৮

নাফিস নুসরাত এষা

বীর বাঙালি

বহুযুগ এল গেল বদল হল কত ধারা
ধারার বদলে কালের কবলে হারায়েছে যারা,
হারিয়ে গেলেও হারায় নি তাদের অমর আন্দোলন,
তাদের চলে যাওয়া কেবল সময়ের প্রয়োজন।

সময়ের স্রোতে যায় নিকো ভেসে গাফফার চৌধুরী
আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।
তাদেরই চেতনা রন্ধ্রে রন্ধ্রে বইছে অবিরত,
ত্যাগের আলোয় গড়ব জীবন আসুক বাধা যত।

হৃদয়ে আমার শহীদ স্মৃতি একুশের স্রোত জাগে
খাঁটি কর তোমার নিজ পরিচয় বাঙালি হও আগে।

একাদশ বিজ্ঞান

তাসনুভা তাবাসসুম

একুশ

একুশ হল ফ্রেব্রুয়ারির রক্তস্নাত গান
একুশ হল ভাষার জন্য বিলিয়ে দেয়া প্রাণ।
একুশ হল শত শহীদের বীরত্বের সম্মান
একুশ হল বীর বাঙালির আত্মত্যাগের দান।

একুশ হল রুধির ধারায় রক্ত-রঙিন পথ
একুশ হল শহীদ মাতার আর্তনাদের রথ।
একুশ হল নর-নারীর উত্তপ্ত শ্লোগান
একুশ হল বুকের রক্তে রঞ্জিত ফরমান।

একুশ হল মুক্তিযোদ্ধার বলিষ্ঠ চিৎকার
একুশ হল একাত্তরের কঠিন হাতিয়ার।
একুশ হল কোটি জনতার গর্বিত সত্তা
একুশ হল লাখো শহীদের সকরুণ আত্মা।
একুশ হল আত্মজয়ী সালাম রফিক জব্বার
একুশ হল তোমার-আমার, একুশ হল সব্বার।

একাদশ মানবিক

এস.এম সাহেদ আহমেদ

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা হল
শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি,
স্বাধীনতা হল
পূর্বগগনে উদীয়মান রবি।
স্বাধীনতা হল
বাউলের গাওয়া গান
স্বাধীনতা হল
মমতাময়ী মায়ের আহ্বান।
স্বাধীনতা হল
মানুষের রঙিন স্বপ্ন
স্বাধীনতা হল
যাকে পেতে মানুষ উতলা নিমগ্ন।
স্বাধীনতা হল
বসন্তকালে কোকিলের কুহুতান
স্বাধীনতা হল
কোটি বাঙালির স্বদেশ প্রেমের গান।
স্বাধীনতা হল
ফসলের মাঠে এলোমেলো হাওয়া
স্বাধীনতা হল
ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি যাওয়া।

একাদশ ব্যবসায় শিক্ষা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

মহান একুশ

বাঙালি আজ কথা বলে বাংলা ভাষাতে
ভাষার জন্য লড়েছি এই মহান একুশে।
ভাষার জন্য আত্মত্যাগ বিরল পৃথিবীতে

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই স্লোগানে
রফিক, শফিক, জব্বার তাই নেমেছিল রাজপথে।
সেদিন বাংলার শত ছাত্র জনতা
বাংলা ভাষার দাবিতে ছিল ঐকবদ্ধ।
শত লড়াই করে পেয়েছি মাতৃভাষা
বাংলা ভাষা পেয়ে আমরা হয়েছি ঋদ্ধ।

অনার্স ৩য় বর্ষ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ

মুনমুন কেয়া শীলা

প্রতীক্ষায় জেগে থাকা রাত্রি

একমুঠো জ্যোৎস্না ছুঁয়ে দেব তোমার ললাটে
একমুঠো স্বপ্ন ছুঁয়ে দেবো তোমার নয়নে
তোমার পদচিহ্ন আঁকা পথে ছড়িয়ে দেবো এক আঁচল
গোলাপ পাঁপড়ি
তুমি ভালোবাসা
প্রতীক্ষায় জেগে থাকা রাত্রি

শিক্ষার্থী, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মহিদুর রহমান

আমার একুশে ফেব্রুয়ারি

একুশে ফেব্রুয়ারি,
তুমি ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিতে,
কত যুবকের তেজস্বী প্রাণ হলো বলি দিতে।

একুশে ফেব্রুয়ারি,
তোমাকে স্মরণ করে বিশ্ববাসী নিতেছে শপথ
রাখব আমার মাতৃভাষার মান
যায় যাবে জীবন, হলে হবে মরণ,
সইবনা কখনো তোমার প্রতি
অবহেলা অপমান।

একুশে ফেব্রুয়ারি,
তুমি অধিকার আদায়ের চেতনা
এই সংগ্রামী বাঙালির।

সম্মান তৃতীয় বর্ষ, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মাহমুদুল হাসান সব্বির

একাদশ, বিজ্ঞান

একুশ

একুশ কোনো তারিখ নয়
নয় কোনো সংখ্যা
একুশ হল মায়ের ভাষা
শীর্ষে তোলার আকাঙ্ক্ষা
মায়ের ভাষাকে দিতে সম্মান
দিয়েছিল যারা প্রাণ
একুশ হলো কবির কণ্ঠে
তাদেরই জয়গান
রাজপথে শহীদের রক্ত যদিও
মুছে গেছে আজ
একুশ হল সেই রক্তে
কৃষ্ণচূড়ার সাজ
পারবে না কেউ কেড়ে নিতে
আমার ভাষার অধিকার
ভাষার জন্য রয়েছি আমরা
সাথে প্রজন্ম স্কয়ার

বৈশাখী সরকার

একুশের চেতনা

একুশ এসেছে হাতে তুলে বিজয় নিশান
বাঙালির কণ্ঠে তাই একুশের গান

তোমার শিরায় চির বহমান রক্তের ধারা
তোমার এমন গতি রুধিবে কারা?
তুমি বাঙালির এক সাহসী যাত্রী
আগমনী তব দূর করে তিমির রাত্রি

জাগে কি স্বপন তোমার মনের ভিতর
হও কি এখনও তুমি স্বপ্নবিভোর?
তাকায়ে দেখো সবুজের ভোর
বেঁধেছো বাংলা তুমি দিয়ে প্রীতিডোর

রুম্মান আরা হোসেন দৃষ্টি

আমার রাঙা বাংলাদেশ

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি
শহীদ মিনারে ফুল সাজানো সারি সারি।
নগ্ন পায়ে আমরা সবাই।
১৯৫২ সালের এই দিনে,
এভাবেই সবাই এক হয়েছিল।
কারো হাতে ছিল ব্যানার
কারো হাতে পোস্টার
কারো কণ্ঠে ছিল স্লোগান।
রক্তের স্রোতে রঙিন হল বাংলার বুক
বাংলা ভাষা পেলাম, এইতো মোদের সুখ।

কত মা পথ চেয়েছিল,
তার খোকা ঘরে ফিরবে।
কত সন্তান অপেক্ষায় ছিল,
বাবা ফিরলে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
কত বাংলার বধূ
মাথায় ঘোমটা তুলে সাঁঝের প্রদীপ হাতে,
পথের দিকে তাকিয়ে ছিল
স্বামী বুঝি তার এলো বলে।

কিন্তু না, কেউ ফিরলো না।
যারা ভঙ্গ করল ১৪৪ ধারা
সারা বাংলায় রইল তাদের রক্তধারা।
তবুও বাঙালি বলে উঠেছিল-
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।
আজ আমিও বলব,
আমি আমার স্বাধীন বাংলা চাই।
রক্তে রঙিন বাংলা নয়,
আমার সোনার বাংলা চাই।

একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা

মৌসুমী আখতার

একুশ মানে

একুশ মানে তোমার আমার মুখের ভাষা
একুশ যেন লক্ষ কোটি প্রাণের আশা
একুশ মানে ত্যাগের মাঝে সুখের হাওয়া
একুশ যেন হারিয়ে অনেক কিছু পাওয়া
একুশ মানে ভাইয়ের শরীর রক্তে মাখা
একুশ যেন মায়ের বুকের দুঃখ-ব্যথা
একুশ মানে অশান্ত হাওয়া বিপ্লবের ডাক
একুশ যেন অর্জনের নেশায় বিপ্লবী এক ঝাঁক
একুশ মানে স্বাধীন, প্রাণ খুলে কথা বলা
একুশ মানে হাতে হাত, এক সাথে পথ চলা
একুশ মানে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা
একুশ যেন ভোর রাতে ঘুম ভেঙে ওঠা
একুশ মানে উঁচু মাথায় বাঁচতে শেখা
একুশ যেন কষ্টের পরে সুখের রেখা
একুশ মানে দীক্ষা নেওয়ার অগ্নি পথ
একুশ যেন মাতৃভাষার জন্য শপথ।

সম্মান ৪র্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ

কাফন চোর

চন্দন আনোয়ার

কানু কাফন চোর।

লাশের শরীর থেকে সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় পাঁচশ টাকার নোটের মত হাতের মুঠোয় নিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওয়ানা হয় বিকারহীন কানু তখন নিজেকে একটি মৃত লাশ-ই মনে করে। শরীরজুড়ে তার মরা মানুষের প্রাচীন গন্ধ। উঠোনে পা ফেলতেই আর একজন জীবিত মানুষ এসে সামনে দাঁড়ায়। তখন তার সম্বিৎ ফেরে।

কানু উঠোনে পা ফেলা পর্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করে শিউলি। ননস্টপ বিড়বিড় করে আল্লাহ-রসুলের নাম জপে, পাঁচ কলমা পড়ে বুকে থু-ফু দিয়ে ভয় দূর করে, স্বামীর হেফাজতের প্রার্থনা জানায়। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো পাথরের মতো বুকে চেপে থাকে। একটি টানা শ্বাস ফেলার মধ্য দিয়ে বুক থেকে পাথর ফেলে ভারমুক্ত হয়, যখন উঠোনের খিড়কির অন্ধকারে ভূতের মত মানুষের ছায়া পড়ে।

আইছো গো!—বলে শিউলি অন্ধকারে নেমে আসে। কানুর হাত থেকে কাফনের কাপড়টি নিয়ে ঘরে ফেরে। ঘর থেকে সাবান লুঙি নিয়ে কলতলায় যায়। শিউলি কল চাপে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে শরীরে পানি ঢালে কানু। ধীরে ধীরে দু-জনের নিঃশ্বাস নরমাল হয়ে আসে। জীবিত হয়ে আসে। কল চাপের উঠানামার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এই ক-টা বাক্য না বললে শিউলির মন শান্তি পায় না।

ছাড়ো! এই কাম ছাড়ো গো তুমি। দেইখবা, পথেই একদিন মরবা নে। রাইত-বিরাতে কত কি জিনিস থাকে।

কলের পিচ্ছিল হাতলের উপরে শরীরের সমস্ত ক্রোধকে চাপিয়ে এই ক-টা কথা বলা শিউলির যেমন রুটিনওয়ার্ক, কানুর তেমনি দায়িত্ব নিঃশব্দে হজম করা। শুধু মন যেদিন বিষিয়ে উঠে সেদিন সিঁধেল চোর বাবা রুস্তম আলির নাম ধরে খিস্তি খেউড় করে। কোনো কাজ-ই শেখায় নি নিজের বিদ্যাটা ছাড়া।

ঝমঝমিয়া গ্রাম, পাশের দাপুনিয়া গ্রাম, তার পাশের ঝাইঠিনসহ আশেপাশের দশ গ্রামের লোকেরা দেখেছে কানুর বাবার দাপট। গৃহস্থবাড়ির পাহারার ফাঁক গলিয়ে কানুর বাবার অনুপ্রবেশ কীভাবে ঘটেছে সেই কিংবদন্তি ওই তিন গ্রামে কে না জানে। গ্রামে এখন বিদ্যুৎ। পাকা রাস্তা। মানুষগুলোও চালাকি ধরেছে। টাকা-পয়সা, গহনা-পাত্তি ব্যাংকে রাখে। দুইটা পয়সা হলে ইটের বাড়ি করে। হুটহাট করে কতগুলো যুবক বিদেশে গিয়ে টাকা কামাচ্ছে।

জন্মাবধি কানুর কাছে দিন হচ্ছে রাত, রাত হচ্ছে দিন। দিনের কাজ সে কিছুই শিখে নি। উত্তর-দক্ষিণ জানা নেই। চেনা নেই কিছুই। ও শুধু জানে, দশ গ্রামে কার ঘরের কোন চিপায় কি লুকানো আছে। কার বউয়ের কানের দুল, গলার চেন, হাতের চুরি সোনার তৈরি, ওটা রাখে কোথায়। কে কখন ঘুমায়। বউয়ের পেট, নিজের পেট, আধ-মরা মা-র পেট ত্রি-পেটের দায়িত্ব যার কাঁধে, সে এখন কী করে? দিনে ঘুমানো অভ্যাস, দিনটা কাটে ভালই। সন্ধ্যার ঘোর না হতেই ফুটফাট বাতি জ্বলে। কানুর ভেতরে কেঁপে ওঠে। সে অন্ধকার দাবি করে, সুনামির মতো অন্ধকার নেমে আসুক, যেন এই সামান্য বাতির আলো সেই অন্ধকারে নাই হয়ে যায়। কানু প্রচণ্ড একটি ভূমিকম্প প্রার্থনা করে, যেন দালানগুলো মাটিতে মিশে যায়।

কানুর বেঁচে থাকার রসদ দরকার। কিছু একটা করতে হবে বেঁচে থাকতে হলে। করবে কী বা যাবে কার কাছে—এই ভাবনায় যখন কাহিল, তখনই নতুন রুজির পথ পায়। যিনি পেট দিয়েছেন, আহারের পথ তিনিই করেন। তাই, কানুর ভিতরে কোনো অপরাধবোধ কাজ করে না। বেঁচে থাকার ধর্ম পালন করছে সে। এই ধর্মই দুনিয়ার সেরা ধর্ম।

একদিনেই ওর ভিতরের সন্ত্রস্ত ভাব কেটে যায়। কাজটি সিঁধ কাটার চেয়ে সহজ ও নিরাপদ। অন্তত একশো টাকার রুজির ব্যবস্থা দুই একদিন বিরতিতে। বেচা-বিক্রির কোনও চিন্তা নেই। চুরির মাল কেনার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে হাসেম দফাদার। যা পায় তাই কিনে। দশ টাকার জিনিস এক টাকায়।

বিদ্যুতের আলোর সামনে দিয়ে বুক চেতিয়ে কানু যেতে পারে কাজে। সেখানে ওর সামনে মানুষের ভয় নেই। তবে প্রতিপক্ষ শেয়ালের সাথে সমঝোতায় আসতে হয়েছে। দুই দলীয় ঐক্যজোট বলা যায়। ওর কাজ যতক্ষণ চলে শেয়ালেরা কিছুটা দূরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে।

কাঁচা বাঁশের ফালির উপরে ঝরঝরে আলগা মাটিতে শাবলের দুই কোপ বসালেই ভিতরে প্রবেশের মতো জায়গা হয়ে যায়। একহাতে টর্চ টিপে আর এক হাতে কাফন গুছিয়ে বেরিয়ে আসতে বড়জোর পাঁচ মিনিট সময় নেয়। এই সময় কানুর নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, চোখে অন্ধকার নেমে আসে, আল্লাহ-রসুলের নাম বোবাপ্রাণির মতো গোঙানির শব্দ হয়ে বেরোয়। কাজ শেষে লম্বা এক শ্বাস ফেলে। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে ছাড়ে কর্মস্থল ।

টানা সাতদিন ধরে কানুর শরীরে জ্বর চলছে। দফাদারের লোক দু-দিন করে তাগাদা দিয়ে গেছে। এই শরীর নিয়ে কানু বেরুতে চায় না। কিন্তু কোনোমতে কাজ দু-টা করে দিতে পারলে দুশো টাকা। সপ্তাহ ধরে রুজি নেই। শরীরের দিকে তাকালে পেট তো মানবে না। শিউলি যে বাধা দিবে সেই শক্তিও নেই। ঘর আহার শূন্য।

ঘর থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় শিউলি ফোঁৎ করে কেঁদে ওঠে। কানুর শরীর ভেঙে পড়ছে। জিরো মনোবল। এই কাজে একচুল সাহস হারালে আর রক্ষে নেই। ঘাড় মটকিয়ে রক্ত চুষে খেতে কত কিছু যে ওঁৎ পেতে থাকে। কানুর মনোবলের কাছে ওরা পাত্তা পায় না। এরমধ্যে বউ দিয়েছে ফোঁৎ করে কেঁদে। কানু কী করবে? বাইরের অন্ধকারের দিকে মুখ করে বলে, কান্দিস না বউ! খবরদার কান্দিস না! দেখিস না, পেটের খবর কেউ লয় না। হারামি দফাদার এক টেকাও অগ্রিম দেয় না।

বেরুবার জন্য সামনে পা ফেলতেই দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে পিছনে ফেরে কানুর ডান পা।

শিউলি ক্যাক করে ওঠে।—তুমি যাইয়ো না গো। মনডা মানছে না। বাইরে দোজখের নাহান আন্ধার। তোমার কোনো বিপদ-আপদ অইলে আমার ...। আঁচলে মুখ ঢেকে ভূতের মত নাকে নাকে কাঁদে শিউলি।

বিপদ-আপদ! কানুর জ্বরমুখো শুকনো ঠোঁটে শ্লেষের হাসি। এই নিয়া তো জন্মাইছি। আমরার জন্মডাই তো বিপদ রে!

আরো দাঁড়ালে আরো বিপদ। বাইরের ঘন অন্ধকারে সাঁতার দেবার মতো করে হামলে পড়ে কানু। আঁকা-বাঁকা আল ধরে হেঁটে সোজা পাকা রাস্তায় ওঠে। কিন্তু রাস্তায় পা ফেলেই তাজ্জব হয়ে গেল। কালো- ডোরা কাটা একজোড়া গরু ধুমসে খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে নাজির আলি হাজির পাকা ধানক্ষেত। হাজির এতো বড় ক্ষতি কে করে? এই গরু দু-টা কার! এইরকম তাজা, এই রঙের গরু তো এই তল্লাটে কারো নেই! কানু ভীষণ দ্বিধায় পড়ে গেল। এতো রাতে! গরুগুলোকে তাড়াতে গিয়ে যদি উল্টো বিপদ ঘটে। তার চেয়ে, হাজির ক্ষেত খাচ্ছে খাক। বিড়বিড় করে হাজিকেই বরং গালি দিল, শালা কুঞ্জুসের ধান খাচ্ছে ভালই করছে।

চোখ কচলে সামনে হাঁটে কানু। কিছুদূর গিয়ে যা দেখল তা আরো ভয়ানক। মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। এবার একটা দুইটা না, বারো-চৌদ্দটা মহিষ কাদের মোল্লার আখক্ষেত দুমড়ে-মুচড়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলছে! রাতে কাজ করে বলে ছেলেবেলা থেকেই কানুর

বহু কিছু দেখার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এই রকম সর্বনাশ দেখে নি। কাদের মোল্লা সকালে ওঠে কি যে চিক্কুর দিবে আল্লামালুম! এমন ভাল মানুষের এত বড় ক্ষতি কে করছে? কে এত বড়ো দুশমন? আর দুশমন হলেই কি ক্ষেতের ফসল এভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে? এ কি মানুষের কাজ! কানু ভাবে, এই কাজের চাইতে ও যে কাজটি করতে যাচ্ছে সেটি অনেক ভাল। বুকে-থু ফু দিয়ে ফের হাঁটা ধরে।

এবার আর কোনদিকে তাকাচ্ছে না। ঘাড়গুঁজে সোজা হাঁটছে। সাত্তার বেপারির বাড়ি বরাবর আসতেই কানু অ্যা বলে পিছু হঠে। লাঠির উপরে ভর দিয়ে তিন মাথা হয়ে দুই পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে এক মাওলানা। তার সফেদ দাড়ি, মাথায় কালো পাগড়ি, শরীরে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি অন্ধকারে ঝিলিক দিচ্ছে। মাওলানাকে পাশ কাটিয়ে যতবারই যেতে চাচ্ছে কানু, হা-ডু-ডু খেলোয়াড়ের মতো পা বাড়িয়ে দিচ্ছে সে। ডানে-বামে যেদিকেই যেতে চাচ্ছে সেদিকে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে না দেখতে মাওলানার দুই পা বেড়ে এতো লম্বা হয়ে গেল যে, ঘাড় উঁচু করেও মুখ আর দেখতে পারছে না। ভয়ে ভিতরটা শুকিয়ে আসে। কানুকে ঘায়েল করার জন্য শয়তানের ক্যারিকেচার এইসব! কানু ভাবে।

শালা, মাইনষের ঘরে ঘরে খাও তো, শরীরে চর্বি জমছে, না? রাইত-বেরাতে ডর দেহায়া বেড়াও, অ্যা! বাগে পাইয়া লই একদিন। আজ শরীরডা খারাপ। এর লাগি ছাইড়া দিলাম। নাইলে শাবালডা বসাই দিতাম বুকের ভিত্‌রে, কইলজাডার মইধ্যে।

কানুর দুর্বল শরীর আরো দুর্বল হয়ে গেল। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। হাঁপিয়ে ধাতস্থ হয়ে হাঁটছে। টালমাটাল শরীর। পা হড়কে পড়ে যায় যায় করে। গুটি গুটি পা ফেলে সামনে চলছে। খুব বেশি দূর যেতে পারে না। আর এক বাধার সামনে পড়ে। নয়াবাড়ির বাঁশঝাড়ের পথে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা কাঁচা বাঁশ। কানু ক্রোধে হিস করে ওঠে।

আমার শরীরডা চলছে না। নইলে জ্বিন-ভূতের বাপের গুষ্ঠিসুদ্ধা উদ্ধার করতাম।

কানু মাথা নিচু করতেই বাঁশটাও নিচু হয়ে আসে। উপর দিয়ে যাওয়াই যাবে না। ছিটকে ওকে নিয়ে যে কোন দেশে ফেলবে কে জানে। বাধ্য হয়ে বাঁশ ঝাড়ের পিছনের ক্ষেত দিয়ে নেমে পাথালে হাঁটা ধরে কানু। ওর শরীরের কন্ট্রোল ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে। সামনে কয়েক ধাপ পথ। এখান থেকে ফেরা চলে না? সাপ-খোপের ভয় আছে। আল্লা-রসুলের নাম নিয়ে বুকে থুথু ছিটাচ্ছে আর পা টিপে টিপে সামনে এগুচ্ছে।

পরিত্যক্ত এক ডোবার ধারে আসতেই কানুর শরীর হুমড়ি খেয়ে ওঠে। কারা যেনো একটা লাশ কবরে না পাঠিয়ে ডোবার কিনারে ফেলে গেছে! ভয়ে গলা শুকিয়ে খটখটে, বুকে থুথু ছিটালেও থুথু আসছে না আর। হাঁটু গিঁট দিয়ে বসে কিছুক্ষণ ভাবল কানু–কী করা যায়? শেয়ালে টের পেলে তো সর্বনাশ করে ফেলবে। মানুষের কী হয়েছে? জীবনটা যার জন্যে ব্যয় করে গেল, মরবার পরে সে এভাবে ফেলে যেতে পারে কী করে? কানু লম্বা শ্বাস টানে। মানুষের এই জীবন? এই নিয়ে কত্ত কিছু করে? কার লাশ হবে? এই লাশটা কোথা থেকে এলো? নাকি কবর থেকে কেউ তুলে এখানে ফেলে গেছে? লাশ কি নিজেই উঠে আসল? না আদতেই মরে নি, জ্যান্ত মানুষকে-ই কাফন পরিয়ে কবর দিয়েছিল, সে নিজেই এতদূর পর্যন্ত উঠে এসেছে! কিন্তু কাপড়ে এমনভাবে জড়ানো-প্যাঁচানো যে, হামাগুড়ি দিয়ে আসার সম্ভাবনা নেই। কাফন চকচকা নতুন। সামান্য মাটির দাগও নেই।

এই লাশের কাফন খসালে কবরে রেখে আসতে হবে। কানুর একার পক্ষে অসম্ভব। এরিমধ্যে কানুর কান ফাটিয়ে শেয়ালবাহিনি হুক্কা হুয়া শ্লোগান ধরেছে। তারা আর সময় দিতে চায় না।

শালারাও আজ তেজ দেহাচ্ছে! মাইনষে না খাইয়া মরতাছে! এইসব মরা খাইয়া শালারা শুয়োরের মতন শইল বানাইছে!

কোনদিন কানুকেই না পেটে চালান করে দেয়। একদিন তো দিবেই।

শরীরের ছন্দ ঠিক রাখতে পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে লাশটার দিকে হাঁটছে কানু। এক পা এক পা করে যতটুকু এগুচ্ছে লাশটাও লাফিয়ে লাফিয়ে ততটুকুই পিছনে সরে যাচ্ছে। কানু চিৎকার করে—কেডা আপনে? কেডা? আপনেরে এইভাবে ফাইলায়া গেছে কেডায়? আপনের কি কেউ নাই? যার লগে জীবনডা কাডাইলেন, হে নাই? ছেলে নাই? ভাই নাই? আত্মীয় নাই? ওরা কি মানুষ না পশু? এইভাবে মরা কুত্তার মতো ফালাইয়া গেল? চিৎকার যে কণ্ঠনালিতে আটকে যাচ্ছে কানুর বুঝতে বাকি নেই। যেই করে হোক, টেনেহিঁচড়ে হলেও লাশটাকে কোন একটা কবরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। একজন মানুষ একটা কবর পাবে না, খোলা আকাশের নিচে গরু-ছাগলের মতো শিয়াল-শকুনে খাবে! রাতে চাঁদ-তারারা দেখবে, দিনে সূর্য দেখবে, এই পথ দিয়ে যারা কাজে যাবে তারা দেখবে শকুন-শিয়ালে খাবলে খাওয়া উচ্ছিষ্ট মানুষটাকে। মানুষের এই ভাগ্য! মানুষের এই অপমান!

কাফনে মোড়ানো অচেনা মানুষটিকে কানু চিনে না। অবলীলায় পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কানুও একজন মানুষ। সে জীবিত আছে। তাই দায়িত্বটুকু তার উপরে-ই বর্তায়। লাশটাকে কবরে পাঠাতে সাংঘাতিক চেষ্টায় মেতে ওঠে। কানু সামনে যায়, লাশ পিছনে যায়। কানু দৌড়ায়, লাশও দৌড়ায়। এই করে কানুর শরীরের শক্তির সবটুকু নিঃশেষ হবার জো হলে লাশ হঠাৎ উধাও। পরাজিত কানু হু হু করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু সেই কান্নাও শক্তিহীন, দুর্বল। বুকের খাঁচার ভিতরে উথাল-পাথাল করে। হাত-পা বিছিয়ে ডোবাটার পাড়ে নিজেই লাশ হয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। আকাশের ঘোমটা কেটে গেছে। কানু তাকিয়ে দেখে—মাথার উপরে সাদা কাফনে মোড়ানো চাঁদ বেদম দৌড়াচ্ছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে কানু যখন কবরস্থানে পা রাখল তখন দু-জন মানুষের ফিসফিসানির কানে ঠেকল। কানু ঘোরের মধ্যেও এটুকু হুঁশ আছে, এই ফিসফিসানি জ্যান্ত মানুষের। এবার মরণ ছাড়া উপায় নেই। কানু ভাবল, লাশের পাহারাদার নাকি? নাকি তার অনুপস্থিতির কারণে দফেদার নতুন লোক সেট করে ফেলেছে ?

শালা অকৃতজ্ঞ বেঈমানের বাচ্চা! তোর গুষ্ঠিসুদ্ধ কবরের না আনলে আমি কানু মাইনষের পয়দাই না। সকালে সব ফাঁস করে দিব। মৃত মানুষের নিস্তব্ধ কবরগুলোকে স্বাক্ষী রেখে দফাদারকে উদ্দেশ্য করে কানু অকথিত ভাষায় গালিগালাজ করে। ফিরে যাবে ভাবে। কিন্তু কাদের সেট করেছে, একবার দেখে না গেলে সকালে কার নাম বলবে। তাই, বিপদ জেনেও সামনে এগিয়ে গেল।

ঐ কে? কেডা? কেডায়ও? কানু চিৎকার করে বললেও অতি সামান্য-ই শব্দ হল।

দু-টি যুবকের কণ্ঠস্বর সমবেতভাবে আক্রমণ করে কানুকে। ঐ কে? কে ঢুকলো এখানে?

পাটের ক্ষেতে অপেক্ষমান অধৈর্য শেয়ালগুলোর কর্কশ চিৎকার ও যুবক দুটোর কণ্ঠস্বর একই রকম শুনাচ্ছে।

কানু আতঙ্কিত হল। কিন্তু ভিতরে জেদের আগুন জ্বলে ওঠে। সে সামনে এগিয়ে গেল, ওরাও এগিয়ে আসে। তিনজন মুখোমুখি দাঁড়াল। অভাবিত এক দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কানুর কাহিল শরীর কাঁপছে, কিন্তু অপর দু-জনের মুখে ভর করেছে মৃত্যু আতঙ্ক। কাফন খসিয়ে নিলে মৃত মানুষ যেমন মুখ হা করে চোখ খুলে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে, যুবক দু-টির মুখের স্থাপনাও তাই হয়েছে। বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে চাঁদের যে পরমিাণ আলো পড়ছে, সেই আলোতে কানু লক্ষ্য করল, পেছনে আরো একজন দাঁড়িয়ে আছে।

যুবক দু-জনকে আড়াল করে পেছনের জন এসে কানুর সামনে দাঁড়াল। দিনের আলো হলে কানু সাহস পেত না, নিতান্তই গভীর রাত ও নিজের কর্মক্ষেত্র বলে সাহস করে বলে ফেলল, আপনে! ছার আপনে? আপনে রে টিভিতে দেখছি। গোরস্থানে পালাইছেন কে রে? পুলিশে...

মানুষটি শাপের মতো হিস্ শব্দ করে আঙুল দিয়ে টিপে ধরে কানুর ঠোঁট। পাঞ্জাবির পকেটে হাত চালিয়ে পাঁচশো টাকার নোট যে কয়টা হাতে উঠল, সে কয়টা কানুর হাতে দিয়ে পেছনে সরে গেল। এবার এক যুবক সামনে আসল।

এই টাকা শেষ হলে আসবে। কাক-পক্ষী জানলেও লিডার কিন্তু... বলে জিন্সের পকেট থেকে ছোট্ট পিস্তল বের করে কানুর থুতনিতে ঠেকাল।

কানু যখন রাস্তায় উঠে আসল ততক্ষণে দিনের সাদাটে আলো গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। জ্বরের ঘোর কেটে গিয়েছে। নয়াবাড়ির বাঁশঝাড়ের বাঁশটি শান্ত-সুবোধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোজা। কাদের আলির আখক্ষেতের কাছে এসে আরো চমকালো কানু—একটি আখগাছও ভাঙা নেই! হাজির ধানক্ষেতও সেই রকমই আছে! কানু যখন বাড়ি পৌঁছাল তখন সকালের সোনারোদ উঠানে পা ফেলতে শুরু করেছে।

কানুর জীবনে একটি রাত কেটে গেল জ্বরের ঘোরে। আজেবাজে যেসব দেখেছে সবই মিথ্যা। চোখের ভুল। অবচেতন মনের খেয়াল। শুধু সত্য হয়ে রইল পাঁচশো টাকার নোটগুলো।

টাঙাওয়ালা

সোলায়মান সুমন

জলপাই রঙের রাত। শুনশান। জিন-পরিরা এসে ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে দাঁড়াল। গত প্রায় দশ বছর ধরে ইব্রাহিম মিয়ার টাঙা টানছে ওরা। এর আগে টানতো ওদের বাবা-মা। এদিকে আবার জিন-পরি ছেলে দুটো টাঙা টানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ইব্রাহিমের একমাত্র পুত্র ইসমাইল। শেষ বয়সে উপহার। ইব্রাহিমের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে সেই কত বছর আগে। ইসমাইল জন্মালে পুরান ঢাকার হোসেনি দালান জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। এই বয়সে বাচ্চা? কলি কালে আর কত কী দেখব!

কেউ কেউ ইব্রাহিমের বউকে এসে বলল, খাইছে দিদি! শেষ বয়সে কামডা কী কল্লা? তোমাগো নসিব খুলছে?

কণ্ঠে ইব্রাহিমের উত্তরে লজ্জা মিশ্রিত বউ বলে, মিয়ারে যেদিন বিয়া করছি নসিব আমার ছেদিন বদনসিব হইছে। নসিব আর ফিরব কেমনে?

বউয়ের এসব ঘ্যান ঘ্যানে কথা শুনতে শুনতে ইব্রাহিমের কান পেকে ঢোল হয়েছে সেই কবে। মেয়ে মানুষের ঐ এক দোষ, যে পাতে খাবে তারই তলা ফুটো করবে। এত দিন বাচ্চা বিয়াতে পারে নি বউ। তারপরও ওকে নিয়েই সংসার করেছে সে। ইব্রাহিমের মা দু'চারটা কথা শুনাত ঐ টুকুই। ইসমাইলের জন্ম ইব্রাহিমের জীবনকে একটা অর্থ দান করেছে।

গাড়ির উপর বেঘোরে ঘুমাচ্ছে ইসমাইল। ঘন আঁধারেও ইব্রাহিম তার চাঁদমুখটা দেখতে পাচ্ছে। ছেলের বয়স নয় দশের আশপাশ । ইব্রাহিম তার হাতটা ছেলের মুখের উপর হাতির কানের মতো এপাশ ওপাশ করে । বুড়িগঙ্গার কালো পানিরমশারা বড়ই ভয়ঙ্কর। হাজারো রোগের বীজ ওদের শরীরে। সদর ঘাটের আশপাশের পানি ময়লার সাথে দলা পেকে বদ্ধ হয়ে আছে। ওখানেই মশা জন্মে। নদীর পানিতে মশা ডিম ছাড়ে, বাপজন্মে কেউ শুনেছিল? আহা! ইব্রাহিমের শৈশবে এই বুড়িগঙ্গার পানি স্বচ্ছ ছিল। রুই , বোয়াল, চিতল কত মাছ ধরা পড়ত । ভুপেন মাছুয়ার জালে একবার ইলিশ ধরা পড়তে দেখেছে সে। আগের কালের সবই খুব ভাল ছিল। ইসমাইলের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ভিক্টোরিয়া পার্কের কোণায় গিয়ে ইব্রাহিম প্রস্রাব করতে বসে। ঘাসের সাথে তার প্রস্রাবের প্রস্রবণের ধারালো শব্দ নিকশকালো নীরবতার পিঠে পোঁচ বসাচ্ছিল। ইব্রাহিমের ভেতরটা অজানা আতঙ্কে শিরশির করে ওঠে। তার বুকের পাটা অনেক বড়। তবুও রাতে পার্কের কাছাকাছি এলে ধমনির রক্ত শীতল হয়ে যায়। এ পার্কে ব্রিটিশ আমলে দেশপ্রেমিক কিছু ভারতীয় সিপাহীদের গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। এরপর থেকে অনেকেই রাতে অশরীরীদের পার্কের গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়াতে দেখেছে। কিছু মানুষের রহস্যজনক মৃত্যুও ঘটেছে এ পার্কে। ভয় পেয়ে ইব্রাহিম কুলুপ না নিয়েই চটপট উঠে পড়ে। সে তার টাঙার দিকে এগোয়। জিন-পরি নামের ঘোড়া দুটো মাথা উপর-নিচ করছিল। টাঙার পেছনে দুজন হাটাহাটি করছে। ওরা পুলিশ সে দ্রুত হাটা দেয়।

একজন পুলিশ চিৎকার করে, এই ওঠ,

স্যার, ওরে উঠাবেন না। ইব্রাহিম বলে।

কেরে তুই? পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর বলে।

এটা আমারই গাড়ি।

ওটা কে?

আমার পোলা।

মাঝরাতে এককেরে মিথ্যা কবি না। ইন্সপেক্টরের সাথে থাকা কন্সস্টেবল বলল।

কী বলেন স্যার?

কনস্টেবলটি ইন্সপেক্টরের ঘোলা অস্পষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে,

কোথা থেকে বাচ্চা উঠিয়ে এনেছিস?

এটা আমার পোলা স্যার, খামাখা সন্দেহ করতাছেন। কথায় জোর দিতে গিয়ে ইব্রাহিমের হাত দুটো নেচে বলে ওঠে।

চোপ! স্যারেরে আঙুল দেখাস? কনস্টেবল বলে।

ইন্সপেক্টর ইসমাইলের ঘুমন্ত মুখে টর্চ মারে। ঘুমন্ত পবিত্র শান্ত একটা মুখ। ইন্সপেক্টরের মন খারাপ। কুরবানির ঈদ গেল। পুরা সপ্তা ঢাকা ফাঁকা। ঠিকমত হপ্তা ওসুল করতে পারে নি। উপর ওয়ালাকে এ মাসের ব্রিফকেশ দিবে কেমনে? কোনো অজুহাত চলবে না। নাজরানা কম হলে মন্ত্রীর বাড়ির গেটে দারোয়ানের ডিউটি কর, নয়তো চৌকিদারি। টেনশনে আজ মদ খেয়েছে সে। ইব্রাহিম কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। ইসমাইলকে ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করে, আব্বাজান। আপনি ওরে জিগান। ইন্সপেক্টরকে বলে সে। ঐ শালা কুরুন চোত! আবার ওর কাঁচা ঘুম ভাঙছিস ক্যান? ইন্সপেক্টর ভীষণ চটে যায়। দে দুশো টাকা দে। স্যার পকেট এককেরে খালি। ইব্রাহিম বলে। মাঝরাতে ঘোড়াগাড়ি নিয়া বইস্যা আছোস ক্যান? তোর লাইসেন্স আছে? রাস্তার পারমিট আছে? কী যে কন স্যার! একশ বছরেরও উপর আমাদের বাপ দাদা এ লাইনে ঘোড়াগাড়ি চালাইতাছে।

তাহলে একশ টাকা ছাড়।

টাকা পামু কই?

কথার গুতোগুতিতে ইসমাইলের ঘুম ভেঙে যায়। ইসমাইলকে দাঁড় করিয়ে ইব্রাহিম সিটের নিচ থেকে পলেথিনে জড়ানো একটা কাগজ বের করে। এ কী রে? কন্সটেবল বলে। ময়লা ত্যাল ত্যালা কাগজ। টর্চের আলোয় সে উল্টেপাল্টে দেখে। কুন ডাস্টবিন থ্যাকা উঠিয়ে এনেছিস রে? পড়ায় তো যায় না। পুরান স্যার। অরজিনাল। ইন্সপেক্টর কাগজটায় সাটানো তিন চতুর্থাংশ ক্ষয়ে যাওয়া ছবিটা ভাল করে নিরীক্ষণ করে।

এটা কার ছবি?

আব্বাজানের।

ধুর! শালা পাগল, রাগে মদটা এবার ইন্সপেক্টরের মাথায় চড়ে। এ স্যার পাগল, এর মাথায় গণ্ডগোল আছে। আবে তোর কাগজ কই? কন্সটেবল বলে। এটা তো তোর বাপের।

এটাই। এটা দিয়াইতো এ্যাদ্দিন করতাছি। বাবা দাদার আমলের পুরান গাড়ি স্যার। আমার পূর্বপুরুষ শায়েস্তা খানের গাড়ি চালাত স্যার।

তো তুই এখানে কী করছিস? তুই প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি চালা গা।

সুভাষ আইবো তিতুমীর আইবো তাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতাছি।

বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা দুখানা লঞ্চের নাম বলে সে। এসব কী বলছিস এরা কারা? ইন্সপেক্টর তার মুখটা ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে নিয়ে এল। ওর কথার সাথে মদের বিশ্রী গন্ধটাও বেরিয়ে আসছিল। স্যার লঞ্চের অপেক্ষা করতাছি। ইব্রাহিম নাকে হাত দিয়ে বলে। স্যার ছেড়ে দেন গরিব মানুষ। কন্সটেবল বলে।

সে ভাবে ইন্সপেক্টর মাল খেয়ে টাল হয়ে গেছে। জানাজানি হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। চলেন স্যার, থানায় ফিরি সকাল হয়ে এল।

কন্সটেবলের ঘাড়ে হাত রেখে এলোমেলো পায়ে আঁধারে ডুবে গেল সাব ইন্সপেক্টর।

আব্বাজান পুলিশ কেলা? ইসমাইল আতঙ্কিত। ওদের কি আওনের যাওনের ঠিক আছে? যেহানে পয়সার গন্ধ আছে, ওহানে যাইব। এবার ওদের মিসটেক হয়ে গেছে। ঘোড়ার মুতের গন্ধরে ট্যাহার গন্ধ ভাবচে।

হুদাই তুমি আমাকে আনছ। আমার এগিনি ভাল লাগে না কয়া দিতাছি!

ভয় পাইছস? টাঙা চালান হিগবি না।

আমি তোমার রহম টাটটু চালামু না।

ভয় কি!

ঘোড়ার গাড়ি আমার ভাল লাগে না। আমি চালামু বাস গাড়ি। ভু....ভু...পি...পি...। ইসমাইল মুখেই বাস চালান শুরু করে।

বাবা দাদার ব্যবসা এডা।

ছাড় তোমার বাব দাদার ব্যবসা– ইসমাইল উত্তেজিত হয়ে বলে।

এমন করে কইস না আব্বা। পূর্ব পুরুষের আত্মা কষ্ট পাইব।

আব্বা আমারে আঁধারে ভূতের ভয় দেহাইও না কইলাম। আত্মার কথা শুনে ইসমাইল আত্মার অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করে। দেহে অজানা ভয়ের শিহরণ কাঁটা দিয়ে যায়।

ইব্রাহিম প্রসঙ্গ পাল্টায়।

এই যে দ্যাখছো বাবা দোকানটা, এ্যাইটা আছিল আমার হরিচরণ চাচার বাকরখানির দোকান। আমাগো বাড়ির লগের বাড়িটা আছিল অগো।

দাদির কাছ থ্যাক্কা হরিচরণ দাদাগো কতা অনেক হুনছি।

উই আমার নিজের চাচার মতোই আছিলেন। আব্বা ওরা ভারত চইলা গেল কেলা?

হে অনেক কতা।

কেলা আব্বা?

নেতাগো মর্জি। দেশডারে ভাগবাটোয়ারা করল। যারা করল। ও সময় তোমার চরণ দাদারা ভারতে চল্যা গেছে। হরিচরণের বাকরখানির দোকানে এখন ফটোস্ট্যাটের মেশিন বসেছে। জগাবাবুর পাঠশালা এখন বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে ফটোস্ট্যাটগুলোর দোকানে। আগে কোথায় ছিল এমন মেশিন। সারাটি দিন রাস্তায়, কোর্টের বারান্দায় খটর খটর চলত টাইপ রাইটার। কালে কত কি বদলায়! দিনে এখানে এতো গ্যাঞ্জাম থাকে যে এ এলাকায় ঘোড়াগাড়ি দাঁড় করানো যায় না। বাসগুলো যখন অনবরত ঘড়ঘড় শব্দে কালো ধোঁয়া ছাড়তে থাকে, প্যা-পু শব্দে হর্ন বাজায়, ভয়ে জিন-পরির কদম এলোমেলো হয়ে যায়। রাস্তায় তখন ওগের নিয়ন্ত্রণ করা ভীষণ কঠিন। ইব্রাহিম একখানা পাতার বিড়ি বের করে। ফুরফুরে বায়ুর টানে ঠোঁটের গোড়ায় তামাক পাতার আগুন ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়ায়। পুট পুট করে তামাক পাতা ফুটতে থাকে। আশেপাশের বাতাস ভারি হয়ে যায়। ইসমাইল নতুন অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চের আশায় আজ বাবার সাথে এসেছিল। কিন্তু সব গুড়ে বালি। কোনো মজা পাচ্ছে না সে। আব্বা যাইবা কই? আব্বা শুনতে পাইতাছ?

'এহান থেক্কা গুলিস্তান কটা টিপ মারুম। ইংলিশ রোড হয়ে নবাবপুর দিয়া...।' 'ইংলিশ রোডের নীলাবর্তী

রতিমতি যুবতী

অঙ্গভরা পিরিতি।'

ইব্রাহিমের প্রথম যৌবনের বাঁধ যার আঘাতে ভেঙেছিল তার নাম লীলাবতী। লীলাবতী কি তার আসল নাম ছিল? নিশ্চয়ই না। আজ রবিবার। রবিবার লীলাবতী ঘরে পুরুষ নিত না। উপোস থাকত সারা দিন। একবার মিলনে ভিন্ন পথের ইচ্ছা প্রকাশ করায় লীলাবতী ওকে কশে চড় মেরেছিল- এ্যাতটুক ছ্যামড়া আমারে বলে কী!

এরপরও অনেকবার লীলাবতীর ঘরে গেছে ইব্রাহিম। ছোকরা বয়সে এতো প্রশ্রয় অন্য ঘরে পেত না সে। খক্ খক্ কাশির সাথে বিড়ির শেষ টানটা দেয় ইব্রাহিম। লীলাবতী, মীনারানী, মালতী, বিলকিস বানু কোথায় হারিয়েছে সব? ভাসতে ভাসতে কোন কুলে,কোন ফুলে, কোন কূলে, কোন গুলে?

এই গুলিস্তান, এই গুলিস্তান। চিৎকার পাড়ে ইব্রাহিম।

আব্বাজান পম্ পম্। হুনবার পাইতাছ ?

পাইতাছি আব্বা, জাহাজ আইতাছে। এই গুলিস্তান গুলিস্তান ...

ইসমাইল গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছিল।

আব্বা তুমি বয়া থাহো। ইব্রাহিম বলে।

যাত্রীরা ইসমাইলকে যাত্রী ভেবে আকৃষ্ট হবে। এই গুলিস্তান, গুলিস্তান।

একটা দুটো করে রিক্সা এসে জিন-পরির পাশে জড়ো হয়েছে।

বস্তা হাতে এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল টাঙাটার পাশে। সে একবার টাঙার দিকে আরেকবার রিক্সাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

ইব্রাহিম চিৎকার করে ওঠে, এই গুলিস্তান, গুলিস্তান। গোলাপ শাহের মাজারে কে যাবি, আয়রে মাত্র দশ টাকা, দশ টাকা। ভাই জান, বহেন এককুনি ছাড়ব। বৃদ্ধ বলল, ছাড়বানি এককুনি?

এইত্তো, আর দু একজন অইলে ছাইড়্যা দেব। আকাশের গাঢ় কালো বর্ণটা ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। আলো ফুটতে দেরি নাই। আজ প্রথম জাহাজটাই এলো দু ঘণ্টা লেটে। ঈদ ফিরতি মানুষের ভিড়ের কারণে এ বিলম্ব। কোত্থেকে ইমতিয়াজ তার টাটটু ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে হাজির হল। কী মিয়া, কয় টিপ? ইব্রাহিম বলে আর কইয়ো না। জাহাজ লেট। ইমতিয়াজকে দেখে ওর মন বিরক্ত।

হে, গুলিস্তান, গুলিস্তান। দুয়েকজন গুলিস্তান। ইমতিয়াজ তার গাড়িতে একজন যাত্রিকে প্রায় হাত ধরে উঠিয়ে বসায়।

কামটা কি ঠিক করলা? যাত্রী লইলা যে? ইব্রাহিম বলে।

এডা আমার পুরান কাস্টমার দাদা মিয়া। ডাহা মিথ্যা বলে ইমতিয়াজ।

ইব্রাহিম বুঝেও চুপ থাকে।

কি দাদু, পোলারে নিয়া আইছো? ইমতিয়াজ বলে।

উত্তরে ইব্রাহিম শুধুই শীতল দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। সিটে বসতে পারে চাপাচাপি করে বার জন। যাত্রী এখন সাতজন।

কী হল যাবে না। কত বসিয়ে রাখবা। একজন যাত্রী বলে।

আর দুজন। এই গুলিস্তান, গুলিস্তান। ইব্রাহিম উঁচুস্বরে ডাকতে থাকে।

আরো তিনজন উঠে বসে।

ছাড়ো এবার । তোমাদের স্বভাব চেঞ্জ হবে না।

এসব কথায় কর্ণপাত না করে ইব্রাহিম ঘোড়ার পিঠে হালকা আঘাত করে। সাথে সাথে লাগাম টেনে ধরে। জিন-পরি নড়ে উঠে। সামনে এগুতে গিয়ে ওদের গলা পেছনে বাঁকিয়ে যায়। গাড়িতে আরো দুজন নেয়া যাবে। ইসমাইলকে সে তার পাশে নিয়ে নেয়।

রিক্সায় ভাগে দুজন করে গেলেই ভাল হত।

শুধু পাঁচ টাকা বেশি লাগত। একজন যাত্রী বিচক্ষণ পরামর্শ দেয়।

ঠিক বলেছেন ভাই। অন্যজন সমর্থন জানায়।

ওরা নামতে উদ্যত হলে ইব্রাহিম তার গাড়ি সামান্য সামনে নেয়। এই চলে গেল গুলিস্তান, গুলিস্তান। মাঝরাত থেকে বসে আছে। যাত্রী সব না উঠিয়ে ছাড়ে কেমনে?

নতুন একজন যাত্রিকে উঠতে দেখে সে খুশি হয়। আবার একজন নেমেও পড়ে।

ইব্রাহিম চিৎকার করে ওঠে, আরে ভাইজান নামছেন কেন? ছাড়তাছি তো।

ওর পেছন পেছন আরেকজন নেমে পড়ে।

ইব্রাহিম সামনে তাকিয়ে দেখে একটা বাস এদিকে এগিয়ে আসছে। যাত্রী দুজন সেদিকেই দৌড়াচ্ছে। বাসের হেলপার বাস চাপড়ে গলা ছেড়ে দেয়, এই গুলিস্তান, গুলিস্তান সাথে সাথে ধাতবকণ্ঠ চিৎকার করে চলে, পম্ পম্, পপ্, পপ্।

ইব্রাহিমের ঘোড়া দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে। পরি তার সামনের পা ঝাড়া দিয়ে ঘাড় নামিয়ে ফোস্ ফোস্ করে দুয়েকবার।

ইব্রাহিমের টাঙা থেকে এক প্যাসেঞ্জার নামতে নামতে বলে, বাসে গুলিস্তান চ্যার টাকা। তার পিছু পিছু অন্যেরা নামতে থাকে।

আরে আরে! কী করতাছেন। ইব্রাহিমের কণ্ঠ চঞ্চল হয়ে উঠে।

একে একে সবাই নেমে যায়। শুধু বৃদ্ধ যাত্রীটি বসেছিল। আসলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

থাহো তোমার টমটম লয়া। আমি বাড়ি যাইতাছি। ইসমাইল টাঙা থেকে লাফ দেয়।

কেলা আব্বাজান। বহো।

তুমি বহো। আমি যাইতাছি। ইসমাইল বাড়ির উদ্দেশে দৌড় দেয়। আব্বাজান, আব্বাজান। মরিয়া কণ্ঠে ইব্রাহিম ডাক দিতে থাকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এসব নাটকে একমাত্র অবশিষ্ট যাত্রীটির ঘুম ভেঙে যায়। 'কি ভাই গুলিস্তান এসে পড়ছি?'

ইব্রাহিম তার তুলোর মতো উড়তে থাকা সাদা চুলগুলোর মধ্য থেকে গড়িয়ে আসা হতাশার ঘামগুলো মুছতে মুছতে বলে, চিন্তা নাই ভাইজান, এহুনি ছাইড়্যা দিমু।

এই গুলিস্তান, গুলিস্তান।

শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
মতিঝিল, ঢাকা।

মাহী ফ্লোরা

ফুল (চকমকি মেঘের আরেক নাম)

ফুলে বুঝি ভালবাসা থাকে! ফুল বুঝি চকমকি মেঘের আরেক নাম?

নাফিসের সাথে যতবার দেখা হয়েছে ঠিক ততবারই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটেছে। যেমন শেষবার পানির ট্যাঙ্কির কাছটাতে দেখা হল সাদিয়ার। হুট করে স্যান্ডেলের পাতলা স্ট্রিপ খুলে গেল। নাফিস ছিল রিকশায়। সাদিয়াকে দেখেই নেমে এসে রিকশা ছেড়ে দিল। বিশাল ক্যাম্পাস। সাদিয়ার ডিপার্টমেন্টে যেতে মিনিমাম পনের মিনিটের হাঁটা পথ। হাতে একদম সময় নেই। স্যান্ডেলটা ছেঁড়া জরুরি ছিল? আরে বাবা রিকশাটা না ছেড়ে তো সাদিয়াকেই রিক্‌শায় উঠার কথা বলতে পারত। স্যান্ডেলটা ছেঁড়াতে এত মেজাজ খারাপ হচ্ছিল সাদিয়ার। দেড়শো টাকার স্যান্ডেল গুলোর এরকমই অবস্থা হয়। কখন কোথায় ছিঁড়তে হবে মান ইজ্জতের কোন চিন্তা যেন মাথায় নাই। ধুর স্যান্ডেলের আবার মাথা।
কি যে সব ভাবছে সাদিয়া।

ভাগ্যিস বইয়ের দোকানগুলোর পাশেই মুচিটা বসে ছিল। অন্যদিন সাদিয়া খেয়াল করেই দেখে নি এখানে মুচি বসে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সাদিয়াকে আসতে দেখে নিশ্চয় ঐ মুচি ব্যাটা মুচকি মুচকি হাসছিল। এই রকমই হয়। সবসময় সাদিয়ার সাথেই এমন হয়। তার কান্না এসে যাচ্ছে। কেন নাফিস যখন থাকে তখনই তার স্যান্ডেলের ফিতা খুলতে হবে। সুন্দর কিছু হতে পারে না? চারপাশে প্রজাপতি উড়বে। বাতাসে ফুলের ফ্র্যাগ্রান্স ভাসবে। সূর্য মেঘে ঢেকে যাবে মানে রোদ নাই হয়ে যাবে। তা নয়। নির্ঘাত এই গরমে সাদিয়ার চোখের কাজল থ্যাবড়া খেয়ে ছড়িয়ে গেছে। কি লজ্জা! কি লজ্জা!
আজকের ক্লাসটা মিস দিলে কেমন হয়? সাদিয়া মনে মনে ভাবে।

নাফিসটা কেমন অদ্ভুত করে যে তাকায়। চোখের চশমাটা আঙুল দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিয়ে সাদিয়াকে বলল এক কাপ চা খাবেন আমার সাথে?

মুচিকে স্যান্ডেল ঠিক করতে দিয়ে সাদিয়া খালি পায়েই এগিয়ে গেল। সবুজ ঘাসের উপর হাঁটতে ভালই লাগছে। খলিল মামার টং এ ঢুকতেই কোণার দিকে একটা বাঁশের বেঞ্চ খালি পাওয়া গেল। মামা মুচকি হাসল।
-মামা রং চা খাইবেন নাকি মালাই চা?
সাদিয়া তাকাল নাফিসের দিকে। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল একটা রং চা, একটা দুধ চা, একটা মালাই চা! মামা আমারে তিনকাপ চা দিবেন। নাফিস আপনি কি চা খাবেন জলদি মামারে বলেন?
নাফিস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। নাহ টং এর বেঞ্চটায় বসে খালি পা দোলাতে তো বেশ লাগে! নাফিসের অবাক দৃষ্টি গায়ে মেখে থাকতে সাদিয়ার কি যে ভাল লাগছে! সে ঠিক করে ফেলল। যতদিন এ ক্যাম্পাসে আছে রোজ তিনকাপ করেই চা খাবে। একেকবারেই তিনকাপ। যদি নাফিস সারাদিনে দু'বার চা খাবার অফার করে, যদি তিনবার অফার করে কিছুতেই তিনকাপের হেরফের হবে না। কিছুতেই না। না হোক সে রাতে ঘুম।

দরকার হলে রুমমেট তিন্নীকে জোর করে জাগিয়ে রাখবে। কানের কাছে ক্যাক ক্যাক করবে ঘুমানোর জন্য। করুক। মটুটা দিনদিন মটুই হচ্ছে তাও ঘুম কমায় না। গত রাতেই তো। সাদিয়ার খুব ভয় করছিল। প্র্যাকটিক্যাল খাতা রেডি করছে এরকম সময় মনে হল জানালার পাশে যেন কার ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। হলের দোতলায় মানুষ ওঠার অবস্থা নেই। এখানকার একেক তলা দোতলার সমান। মানে সাদিয়ার দোতলার এই রুমের উচ্চতা অবশ্যই চারতলার মত হবে। যুক্তি যত যা-ই বলুক তার তো ঠিকই ভয় করছিল। আর তিন্নী? ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে। কি যে অসহ্য লাগছিল সাদিয়ার।
নাফিস আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? নাহ এটা কোন প্রশ্ন হল? নাফিসের দেশের বাড়ি ময়মনসিংহ। এটাতো সে জানেই। তাহলে কি কথা বলা যায়?

উম্ খলিল মামা চা টা খুব বেশি ভাল বানায় তাই না?

স্যান্ডেল ঠিক হয়ে গেছে। পায়ে গলাতে গলাতে সাদিয়া আপন মনে বলে-
কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলো
তোমার প্রেমের কথা তোমার যন্ত্রণা,
তুমি ভালবাসো আমাকেই যেন ভালবাসো তাই সান্ত্বনা!

-আমাকে কিছু বলছেন?
-হ্যা বলছি। বলছি যে অনেক আগে একবার সিঁড়ির কাছে একটা ছেলে আমাকে জোর করে চেপে ধরেছিল। কি করেছিল বলব না। আপনি বুঝে নেন। সেই ছেলেটার নাম ছিল নাফিস। আপনার নামও নাফিস!

নাফিস থতমত খেয়ে যায়। কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। সেই নাফিসের জন্য কি তার স্যরি বলা উচিত? এই মেয়েটা এমন পাগল কেন? নাফিসের খুব মন খারাপ হতে থাকে। যেন সেই ছেলেটার সমস্ত অপরাধ তাকে লজ্জায় নুইয়ে দিতে থাকে মাটিতে। বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া সে ঘটনার জন্য যদি মাধবীলতার মত মেয়েটি তাকে কোনদিন বন্ধু হিসেবেও কাছে আসতে না দেয়। কষ্টের ব্যাপার হবে। খুব কষ্টের ব্যাপার হবে। নাফিস গত তিনরাত টানা এই মেয়েটাকে স্বপ্নে দেখেছে। এটা এত অস্বাভাবিক, সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না। তার কাছে মনে হয় সে জেগে জেগে কল্পনা করেছে। হালকা তন্দ্রার মত ছিল আর হয়ত ভেবেছে স্বপ্ন। আজকের ক্লাসটা জরুরি ছিল বলেই তাড়াহুড়ো করে রিকশা নিয়ে ছুটে এসেছে। সারারাত ঘুম হয় নি। সকালের দিকে চোখ লেগে আসে। ঘুম ভাঙতে চায় না। অথচ মাঝপথে সাদিয়াকে দেখে সব এলোমেলো হয়ে গেল। রিকশা ছেড়ে তার হঠাৎ মনে হল চা খাওয়া দরকার। ভীষণ দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার এই মেয়েটাকে।

নাফিস, আমাকে তুমি বলবেন? সাদিয়া, সাদিয়া আরেকটু প্র্যাকটিকাল হও। এভাবে যদি কোন ছেলেকে তুমি বলতে বল সে তোমার ঘাড়ে চেপে বসবে। তুমি ক্লাসনোটের সুবিধা পাবে তা ঠিক, কিন্তু তোমার বিকেলের ঘোরা, বন্ধুবান্ধব সব নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। তোমার ফোন সবসময় বিজি পাবে তোমার কাছের মানুষজন। তুমি কী পরবে, কী খাবে, কী করবে সব সেই ছেলের ইচ্ছের হাতে চলে যাবে। সাদিয়া আরেকটু বুঝেশুনে পা ফেলো প্লিজ।
-হাসছেন যে?
-হু হাসছি। আমার রাজহাঁস অনেক ভাল লাগেতো তাই।

কী কথার কী উত্তর। নাফিসের মাথা আরো এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। বোটলগ্রাসে ঝুমকোর মত লাল ফুল এসেছে। বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলতো করে একটা ঝুমকো ফুল ছিঁড়ে নিল নাফিস।

-আচ্ছা শুনুন, আমার কাজল কি লেপ্টে গেছে? ওমা! ফুল ছিঁড়লেন কেন? ফুল ছিঁড়লে কী হয় জানেন?

নাফিস আমতা আমতা করে বলল, কী হয়?

-কী আবার হবে। যা হবার তাতো এতক্ষণে হয়েই গেছে। গাছের একটা ফুল কমে যায়। দিন, আমার হাতে দিয়ে দিন।

সেদিন ফিরে এসে সাদিয়া ফুলটাকে গোপন কাপড়ের মত বইয়ের ভাঁজে রাখল। পাতা খুলে কতবার যে দেখল। তারপর গভীর রাতে সে খাতা খুলে এই লাইনটা লিখেছিল–

আমাদের ভুলগুলো এতদিনে বোটলগ্রাসের মাথায় এসে নেমেছে। গাছটি হয়েছে ঋতুবতী। আর সব ঘাস মেঘ বিদ্যুতের তারে বসা কাক আমাদের ভুলগুলো

জেনেছে!

.....

পৃথিবীর সব গল্পের শুরুটা এরকম মিষ্টি হলেও হতে পারত। হয়ত হয়ও। অথচ একটা সময় কখন যে বিরহ আসে। তখন সাদিয়া নিজেই হয়ত খাতা খুলে কাঁদতে কাঁদতে লেখে–

কেন তার হাতে পাখিদের সুখ, কেন তার বুকে ঠাণ্ডা একটা হাত,

কেন সেই হাত আগুন হলো না, তুহিনের মত ঝরে গেল সারারাত।

অথবা বিরহ আসেই না, শুধু সুখ আর অনন্ত সুখ।

ইসমাইল হোসেন সোহাগ

অমানুষ

সকালের সূর্য কিন্তু তখনও ওঠে নি। ভোরের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে চারদিক। আলোর সাথে অন্ধকারের বেশ আলিঙ্গন তখনও। ফজরের নামাজ শেষ করে যার যার মত করে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ মসজিদেই শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। রমযান মাসের নাজাতের দিনগুলো তখন চলছিল। সেহেরি খেয়ে নামাজ পড়ে কেউ কেউ মাঠে যাচ্ছে আবার কেউবা শুয়ে শুয়ে ঘুমানো বা গল্প করবার চেষ্টা করছে। রাকিব তেমনি সময় বাইরে বের হয়েছে। সমবয়সী অন্যান্য ছেলের মত নামাজ সে খুব একটা পড়ে না। আজকে ইচ্ছে করলে অবশ্য পড়তে পারত। কারণ, নামাজের সময় তখনও ঢের বাঁকি। কিন্তু তাতে কী? সেদিকে তার কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর আবার গত রাতে তার ঘুম খুব একটা ভালো হয় নি। কাল দুপুরের পর থেকেই তার শরীরের ভেতরে কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছিল। বিষয়টিকে তেমন কোন গুরুত্ব না দিলে সারারাত জ্বর ওর সাথে লুকোচুরি খেলেছে। তাই এপাশ ওপাশ করে তার সারাটি রাত কেটেছে। ঘুম বলতে গেলে ঘণ্টা দুয়েক হয়েছে। তাই আজ সকাল সকাল উঠেছে। ১৩-১৪ বছরের কিশোর এই রাকিব, এক রাত্রের জ্বরে তাকে পাড়তে পারে নি বিধায় সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বেরিয়েছে বাইরে।

মাকুপাড়া মোড়ের দোকানগুলোর বাইরের বৈদ্যুতিক বাতি তখনও নিভে যায় নি। কোনো দোকানদার নেই। আবার যে প্রহরি, সেও কানে কম শোনে। আর মানসিকতায়ও একটু অস্বাভাবিক। তাই সকাল হয়েছে বিধায় আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে। এমন নির্জন, নিরালায় শুধু একাই রাকিব।

মোড়ের তিন মাথায় দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে দু দিকে প্রসারিত করে উপরে উঠিয়ে টানা একটা হাই তোলে সে। হাত দুটো সামনে পেছনে যতটুকু যায় ততটুকু প্রসারিত করে রাস্তা বেয়ে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় শুয়ে থাকা কুকুরগুলো মাথা তুলে পরিচিত লোক দেখে আবার শুয়ে পড়ে। বাচ্চা কুকুরটি তেড়ে আসতে লাগলে ধমকে তাড়িয়ে দেয় রাকিব। মা কুকুরগুলো চোখ মেলে পরিচিত লোক দেখে আবার চোখ বন্ধ করে। মনে মনে ভাবে বাচ্চাগুলো এত লাফায় কেন? ধমকাক। একটু শিক্ষা হোক। তাহলে পরে আর চেঁচাবে না।

রাস্তার ডান দিকে যেখানে নলখাগড়ার সম্মিলিত আলিঙন সেখানে লুঙিটা কিছুটা উপরে তুলে খানিক বসে এদিক ওদিক তাকায় রাকিব। আম ভাঙার কয়েকজন শ্রমিক সাইকেল নিয়ে পাস কেটে চলে গেল। দু একটা পাখি ডাকতে শুরু করেছে। প্রাকৃতিক চাপ, মানে না শ্বশুর কিংবা বাপ। কাজ সেরে ঢিলাসহ হাতটি ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে আবার মোড়ের দিকে আসতে থাকে রাকিব। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি নছিমন গাড়ি ছুটে আসে। যাকে গ্রামের ভাষায় বলে ভুডভুডি। সাত সকালে স্টেশনে গিয়ে তাদের সিরিয়াল দিতে হয়। যাদের সিরিয়াল যত আগে পড়বে তারা তত আগে ভাড়া নিয়ে যেতে পারবে। তাই সকলটাতে ভুডভুডিওয়ালাদের একটু তাড়া থাকেই। গাড়িটির চালক শরীফ অবশ্য অস্বাভাবিক রকমের রশিক। তার গাড়িটা বাঁকিয়ে একেবারে রাকিবের গা ঘেঁষে নিয়ে যায়। অনেকটা ভয় পেয়ে যায় রাকিব। এবার পেছন দিকে তাকিয়ে মুচকি মেরে হাঁসতে হাঁসতে ভুডভুডিতে চলে যায় শরীফ। এবার রাস্তা থেকে উঠে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে গাড়ির দিকে। রাগে গজগজ করলেও ধরতে না পারায় কিছু বলতে পারে না রাকিব।

তারপর হাত পা ঝাড়তে ঝাড়তে এগোতে থাকে রাকিব। রাস্তাঘাট একেবারে পরিষ্কার। কোন যানবাহন নেই, মানুষ নেই, কোন কিছুই নেই। শুধু তিন চারটি কুকুর তিন মাথার মোড়ে একত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তেমন কারও সাথে সাক্ষাতও নেই। অন্ধকারে মানুষের মুখ তখনও খুব একটা চেনা যাচ্ছে না। একটু একটু করে দু একজন এদিক সেদিক যাচ্ছে। পাখির কিচিরমিচির শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে। কয়েকদিন আগে জন্ম নেয়া ডাহুকের বাচ্চাগুলো খাবারের উদ্দেশ্যে মায়ের সাথে সবেমাত্র বাইরে বেরিয়েছে। ভোরের হাওয়া যে এত

সুন্দর এর পূর্বে রাকিব পর্যবেক্ষণ করে নি। নীরব হাওয়ায় একা একা হাঁটতে ভালই লাগছে তার। বাতাসে ভাসা-ভাসা দু একজনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মনে হয় চিৎকার। আসলে তা চিৎকার কি-না স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু শব্দটি কোন দিক থেকে আসছে তা বোঝা মুসকিল। কিন্তু শব্দটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। প্রথমে দিক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও কিছুক্ষণ পর মানুষের দৌড়া-দৌড়িতে বোঝা গেল শব্দটি পূর্ব দিকের।

মসজিদের ভেতরে যারা অবস্থান করছিল তাদের কেউ কেউ দৌড় দিল আবার কেউবা জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। বোঝেন না গ্রাম সমাজের মানুষের সেই স্বভাবটার প্রতিফলন সর্বদাই ঘটে। কি হয়েছে তা জানার কোন প্রয়োজন নেই। আগে চিলের পেছনে ছোটা। যখন দেখা যায় চিলের বাচ্চাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন গাধার মত আবার হাঁসতে হাঁসতে গালাগালি করতে করতে বাড়ি ফেরে। এ অভ্যাস বাঙালির নিত্য জনমের। আগেও যেমনি ছিল বর্তমানেও টিক তেমনি আছে। সুতরাং, আজকেও তার ব্যাতিক্রম ঘটে নি।

যতটা সময় যায়, শোরগোলের আওয়াজ ততই বাড়তে থাকে। মনে হচ্ছে মানুষ চারদিক থেকে একসাথে পূর্ব দিকে জমা হচ্ছে। ক্রমেই উচ্চস্বরের আওয়াজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আওয়াজ সামনে বাড়তেই থাকে। বিষয়টি রাকিব প্রথমে ততটা গুরুত্ব দেয় নি। ও মনে করেছে, যে হারে চেঁচামেচি আর ছোটাছুটি করছে মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। আর সেজন্য সবাই পালানোর চেষ্টা করছে। অবশ্য মনে হবারই কথা। গত কয়েকদিন ধরে ভূমিকম্পের যে আক্রমণ তাতে অন্যটা অনুমান করবে কীভাবে। প্রতি রাত্রে দু তিন বার সব কিছু কেঁপে ওঠে। মনে হয় এবার বুঝি সব কিছু ভেঙে গেল! এই বুঝি গেল! রাকিবের চোখে-মুখে তেমনি আশঙ্কা। তার মনের কোণে তখন বীণ বাজিয়েই চলেছে- আমি অবশ্য ভাল জায়গাতেই আছি। এখানে কোন সমস্যা হবে না। তাই তার মধ্যে কোন উদ্বিগ্নতা নেই। কিন্তু নিমেষেই গ্রামের আর সকল মানুষ যখন দা, কুড়াল, খুন্‌তি, কাস্তে, ফালা, ছোরা ইত্যাদি নিয়ে পূর্ব দিকে দৌড়াচ্ছিল, তখন রাকিবের কিছুটা চৈতন্য ফিরে আসে।

চিরচেনা বাঙালির মত এরাও কিছু জানে না। সামনের লোক যাচ্ছে তাই তাকে স্মরণ করে পরের মানুষটির যাত্রা। ওখানে গিয়েই হয়ত জানা যাবে কি ঘটনা। তাই আর সকলের মত রাকিবও তার লুঙ্গির নিচের এক অংশ এক হাতে ধরে দৌড় দেয়। খালি হাত বলে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। কিন্তু একশ, দুশ গজ যাওয়ার পরে থমকে দাঁড়ায়। তার কাছে তো দুটো মোবাইল আছে। হট্টগোলের মধ্যে তো মোবাইল হারিয়ে যেতে পারে? তাই এগুলো বাড়িতে রেখে যাওয়াই নিরাপদ। ঘুরে উঠে পেছনে দৌড়াতে থাকে রাকিব। পথিমধ্যে রাকিবকে উল্টো দৌড়াতে দেখে দু-চার জন জিজ্ঞাসা করে সামনে কি হয়েছে? ও শুধু বলে- আমি জানি না। বাড়িতে এসে মোবাইল দুটো বিছানার উপর ফেলে দিয়ে ছোট লাল রঙের হিরো সাইকেলের সাথে দা'টি ঝুলিয়ে নিয়ে আবার দে ছুট। রাস্তায় মানুষের চোটে যেন প্রতিটি ধাপে ধাপে দু তিনটা করে বেল বাজানো লাগছে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং বেজেই চলছিল।

আর যাই হোক রাকিব কিন্তু বোকা নয়। যথেষ্ট সহজ সরল হলেও তাকে কেউ ঠকাতে পারে বলে মনে হয় না। এই বয়সেই কযেকজন মেয়েকে এক সাথে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে দিক থেকে এ গ্রামের আর আর সকলের দিক থেকে উপরে। কিন্তু কথা গুলো মিষ্টি মিষ্টি করে বললেও আগে পিছে যথেষ্টই ভেবে বলে।

রাস্তায় যে পরিমাণ মানুষের ভিড় এতে করে খুব একটা দ্রুত সে যেতে পারে নি। অনেক কষ্টের পরে সেখানে গেলেও সহজে সে জায়গায় সে পৌঁছাতে পারে নি। অনেক দূর থেকে সে বিষয়টা হালকা হালকা শুনল। ঘটনার উৎস সেখান থেকেও প্রায় আধা কি.মি. দূরে। ধোপার বিলের ঠিক মাঝটায় যেখানে সাঁকো আছে ঠিক সেইখানে। সেই খানটায় সামান্য ঝোঁপ ঝাড় থাকলেও এখন শুধু সেখানে মাথাই দেখা যাচ্ছে।

সাইকেল নিয়ে কোন রকমে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার সাইডে একটা গাছের সাথে রড তালার মাধ্যমে আটকে। আরও সামনে এগোয় সে। সেই সময় তাকে সাঁকোর কাছে পৌঁছাতে মোটামুটি আরও একটি ভিয়েতনামের যুদ্ধ করা লাগে। যুদ্ধ শেষ করে সাঁকোর উপরে গিয়ে রাকিব তো একেবারেই হতবাক। দুজনের দুটো হাত কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। কখনও জ্ঞান আসছে কখনও আসছে না। আর একজনকে লোকজন পিটিয়েই মেরে ফেলেছে। গ্রামবাসি অনেকেই আবার মারার চেষ্টা করছে। কয়েকজন মার ঠেকানোর চেষ্টা করছে। অন্য দুজনকে চিনতে না পারলেও মৃত ব্যক্তিটিকে চিনতে রাকিবের একটুও কষ্ট হয়নি। ওটা ওদের গ্রামেরই ছেলে, নীলু। যথেষ্ট বনেদি ঘরের ছেলে। তার দ্বারা এ ধরনের কাজ অসম্ভব না হলেও এখন সম্ভব বলে কেও মানতে পারছে না। আশে-পাশের গ্রামের মানুষ এদেরকে ধরে পাকড়াও করে রেখেছে। শুনলাম পুলিশ আসছে।

জায়গাটিতে গত কয়েকদিন যাবৎ বেশ কয়েকবার ছিনতাই হয়েছে। তার মধ্যে দুজন জামে মসজিদের ইমাম। সর্বশেষ যাকে ছিনতাই করা হল সে পাশের গ্রামে তারাবির নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিল। ফাঁকা রাস্তায় ধরে সব কিছু ছিনিয়ে তো নিয়েছেই আবার মেরে ডান হাতটা ভেঙে দিয়েছে। তার কিছুদিন পূর্বে পাশের গ্রামের আর একজনকে ধরে মেরে তার সমস্ত শরীর থেঁতলে দিয়েছে। এমন ঘটনা প্রায়সই ঘটতে থাকে। পুলিশ কে বারবার বললেও পুলিশ এর কোন সমাধান দিতে পারে নি। অবশেষে আশেপাশের দু চার গ্রামের কিছু যুবক একত্রে বসে ঠিক করে যেভাবেই হোক এটা বন্ধ করতে হবে। সেই অনুযায়ি তারা পরিকল্পনা করে। অতঃপর দু-তিন দিন জেগে থেকে আজ হাতেনাতে ধরে বিচার কাজও সম্পন্ন করে দিয়েছে।

আজকে ভোরে নাকি কুশরের গুড়ের ভ্যান আটকে ছিল। একেবারে সকালে। ব্যাস আর যাবে কোথায়। মারে মার খেল, জীবনটাও হারাল। সাংবাদিকের খাতায় নাম উঠল, রোড ডাকাতিতে নিহত কাইলি নিলু।

রাকিব কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এখানে থাকা কি ঠিক হবে? নাহ! না থাকাই ভাল। শেষে আবার কোন বিপদ কার উপর পড়ে, কে জানে। না, রাকিব অত বোকা নয়। অন্যের দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাবে না। এবার সে পেছন দিকে পা বাড়াল। তখনও অজস্র মানুষের স্রোত নেমেছে। ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার রাখা সাইকেলের দিকে। কিন্তু মানুষের ভিড়ে তা আর দেখা গেল না। রাকিব দ্রুত এদিক সেদিক খোঁজার চেষ্টা করল। আশেপাশে চারদিকে তার নজর ছড়িয়ে দিল। তখনও মানুষ হৈ-হৈ করে সমস্ত রাস্তা দিয়ে সাঁকোর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের ভিড়ে চোখের দৃষ্টি তার খুব একটা ছড়াল না।

গাছের নিচে ভাঙা রড তালাটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। সেদিকে চোখ পড়তেই
রাকিবের বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। পেছন থেকে নাহিদ রাকিবের ঘাড়ে হাত রেখে ৩২ টি দাঁত বের করে বলল-'রাকিব বাড়ি যাবি না?'

অর্পিতা সরকার

বলিরেখার দিনগুলোয় প্রেম

চট করে একবার চারপাশ দেখে নিল বদর আলী। না আশেপাশে কেউ নেই। এক ফাঁকে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়া যায় পাশের কচু ঝোপটায়। তারপরও বদর আলীর পা চলতে চায় না। রাজ্যের লজ্জা এসে ভর করে। এসব কচুঘেঁচু কুড়ানোর কাজটা সাধারণত তার স্ত্রী শরিফাই করে। গত দুদিন ধরে পুরোনো বাতের ব্যথাটা তাকে ঘরের বাইরে পা ফেলতে দিচ্ছে না। এ কারণে বদর আলীর হয়েছে মহাবিপদ। এই বয়সে বনেবাদাড়ে কচুঘেঁচু খুঁজে বেড়ানো তাকে কি মানায়? তারপরও সারাক্ষণ দাউদাউ করতে থাকা পেটটাকে তো কোনমতে সান্ত্বনা দেওয়া চায়। বদর আলী প্রায় ঢুকেই পড়েছিল ঝোপটায়। হঠাৎ কলরব শুনে ধীর পায়ে পিছিয়ে আসে। পাশের বাড়ির ফজরের ছেলেমেয়ে দুটো এদিকেই আসছে। লজ্জাটা এবার দারুণভাবে পেয়ে বসে তাকে। বুনো কচুর ঝোপটা পেছনে ফেলে হনহনিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয় সে। স্ত্রীর সাথে আজ তার একচোট ঝগড়া হবেই। শরিফা তার অপেক্ষায় আছে। কচু নিয়ে বাড়ি ফিরলে তবে উনুনে আগুন জ্বলবে। শরিফা হয়তো এতক্ষণে শুকনো পাতা জোগাড় করে রেখেছে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘরে ফেরে বদর আলী। ঘরে ঢোকা মাত্র শরিফা তার হাতের দিকে তাকায় "খালি হাতে ফিরলা যে কচু কোয়ানে? ঘরে খাওনের কিছু নেই জানো না ?" শরিফা প্রশ্নের বাণ ছুড়তে থাকে বদর আলীর দিকে। 'আমি ঐসব কাম করতে পারুম না। আমার একটা সন্মান আছে। আমারে এই নিয়ে আর কিছু কইও না'–অপরাধীর মত বলে বদর আলী। "গরীব মাইনষের আবার সন্মান। এতই যদি সন্মানে লাগে তাইলে দুই পয়সা রোজগার কইর‍্যা আনো দেখি। তার মুরোদ তো নাই।" শরিফার কথা ঠিকই। রোজগার বদর আলী করে না। বয়স তার প্রায় ষাট এর কাছাকাছি। উপোস করা, রোগাভাগা শরীরে সে কাজ করতে পারে না। কিন্তু একদিন তো সে কম পরিশ্রম করে নি। আজ তার অপারগতা এভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর খুব কি প্রয়োজন ছিল ? তোমার না হয় সন্মান নেই, তাই বলে কি আমারও নেই। আমার মানা সত্ত্বেও তুমি মন্ডলগো বাড়িত রোইজ ভোরবেলা যাও। আমার ঘুম ভাঙনের আগে আবার ফিইর‍্যা আসো। এই বয়সেও তোমার চরিত্রে লাগাম নাই। নিজেরে আগে শুধরাও।" ক্রোধে ফেটে পড়ে বদর আলী। যে বউকে সে এতো ভালোবেসেছে সেই আজ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। গরগর করতে করতে বদর আলী ঘর থেকে বের হয়ে যায়। জীবনে তার শান্তি নেই। সবুজ ধানক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে থাকে সে। শামুক আর কেঁচোর দলও হাঁটতে থাকে তার সাথে। কিন্তু বদর আলী কার কাছে যাবে? সম্মুখে শুধুই আঁধার। এই দুনিয়ায় তার কষ্ট বোঝার মত কেউ নেই। হাটের দিকে এগোতে থাকে বদর আলী।

শরিফার চোখে মুখে আতঙ্ক আর চিন্তার অভিব্যক্তি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়েছে। স্বামী তার এখনও বাড়ি ফিরল না। চায়ের দোকানের আযাদ খুঁজতে বেরিয়েছে বদর আলীকে। বিপদে-আপদে আযাদই এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ায়। রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু মনের সম্পর্কটাই যেন বড় হয়ে ধরা দিয়েছে। শরিফাও আজাদের সাথে আসতে চাচ্ছিল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আযাদ তাকে বাড়িতে রেখে এসেছে। শেষ পর্যন্ত বদর আলীকে পাওয়া গেল নদীর তীরে। বদর আলীর বিষণ্ন দৃষ্টি নদীর স্রোতের উপর। ছোট ছোট কচুরিপানা ভেসে চলেছে স্রোতের টানে। তার জীবনটাও কি কচুরিপানার মত অনিশ্চিত, অবহেলিত নয়? "বাড়ি চলো চাচা। চাচী কাইন্দা মরতাছে।" আযাদের ডাকে বদর আলীর ভাবনায় ছেদ পড়ে। "আমার লাইগ্যা কান্দনের কি আছে? তোর চাচির তো পিরীতের মানুষের অভাব নাই।" অভিমানী কণ্ঠস্বর বদর আলীর। "চাচা তুমি সত্যটা জানো না। চাচি মন্ডলগো বাড়িত পিঠা বানাইবার কাম নিছে। তুমি পছন্দ করো না বইল্যাই চাচি তোমারে জানায় নি। তোমার পোলায় যে ট্যাকা পাঠায় তাতে সংসার চলে না চাচা।" আজাদের কথায় বদর আলীর মনে একাটা ঝড় বয়ে যায়। বিনা দোষে কত বড় অপবাদ দিয়েছে সে শরিফাকে। সংসারের অভাব অনটন আজ পর্যন্ত শরিফায়ই সামলেছে। হয়তো নিজে উপোস করে স্বামীর পাতে খাবার

তুলে দিয়েছে। বদর আলী বাড়ির পথ ধরে। কুপি জ্বালিয়ে শরিফা তার পথ চেয়ে বসে আছে। বদর আলীর দিকে চোখ পড়তেই তার পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে শরিফা। কাঁপা কাঁপা হতে শরিফাকে টেনে তোলে বদর আলী। শরিফা কিছু বলার আগেই তার রুক্ষ ঠোঁটের শেষে নির্যাসটুকুও যেন সে শুষে নিতে থাকে।

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল–২১২

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, রাজশাহী

- আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- সবার জন্ম নিবন্ধন করুন।
- নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- যেখানে সেখানে ময়লা বা আবর্জনা ফেলবেন না।
- রাত্রিকালীন আবর্জনা অপসারণে সহযোগিতা করুন।
- গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।

এই মহানগরী আপনার
একে সুন্দর রাখার দায়িত্বও আপনার

এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান (লিটন)
মেয়র
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চন্ডীদাস
শতাব্দী কাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন
তোমার থরোথরো ভালোবাসার নাম রবীন্দ্রনাথ
বিজন অশ্রুবিন্দুর নাম জীবনানন্দ
তোমার বিদ্রোহের নাম নজরুল ইসলাম
তোমার রূপের আমি কোনো সীমা পাই না

- হুমায়ুন আজাদ